দিল কি দুনইয়া

আত্মশুদ্ধি

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.

পার্থিব জীবনে অনাবিল সুখ ও
পরকালে চিরশান্তি লাভের উপায়

আত্মশুদ্ধি

মূল

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)

মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান

সংযোজিত

দৈনন্দিন আমল ও আত্মশুদ্ধির সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

মূল ঃ ডাঃ আবদুল হাই আরেফী (রহঃ)
বিশিষ্ট খলীফা ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

দাওরা ও ইফ্‌তা ঃ জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস ঃ জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব ঃ রাজারদেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আত্মশুদ্ধি

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

প্রকাশক
আবু সা'দ
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

অষ্টম মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৮ ঈসায়ী
সপ্তম মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৭ ঈসায়ী
ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ আগষ্ট ২০০৬ ঈসায়ী
পঞ্চম মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৫ ঈসায়ী
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ রবিউল আউয়াল ১৪২৫ হিজরী
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মুহাররম ১৪২৪ হিজরী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মুহাররম ১৪২৩ হিজরী
প্রথম মুদ্রণ ঃ রজব ১৪২০ হিজরী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-31-8

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

ATTO SHUDHDHY

By : Maulana Mufty Muhammad Shafee (RH.)
Translated by : Muhammad Habibur Rahman Khan
Price Tk. 100.00 US $ 6.00 only

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী,
হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) ও মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত
মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত
বারাকাতুহুম)-এর অন্যতম বুযুর্গ খলীফা
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব (দামাত
বারাকাতুহুম)-এর দস্ত মুবারকে।
যিনি আল্লাহ্ ওয়ালাদের সোহ্বত ও অক্লান্ত সাধনায়
দ্বীনের অগাধ ইলমের অধিকারী।
এই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব যখন আত্মশুদ্ধির মহান ফিকির
নিয়ে ছুটে বেড়ান দিন-রাত, তখন নিজের মধ্যে
আত্মোপলব্ধির জাগরণ অনুভব করি। তাঁর হৃদয় গলানো
ইখলাস পূর্ণ সাদাসিধে বয়ানে যখন অনেক লোককেই
পথের দিশা লাভ করতে দেখি, তখন নিজের মধ্যে
নফসের হাতছানি উপেক্ষা করার হিম্মত খুঁজে পাই।
তাঁর স্নেহ ও মহব্বতের ঋণে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে
মুনাজাত করি–
ইয়া আল্লাহ! আপনি তাঁর হায়াত দারায করুন।

——————————— অনুবাদক

অনুবাদকের আরয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ। ইসলামের কিছু বিধি-বিধানের সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে হালালভাবে উপার্জন করা, মা-বাপ-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্যদের হক আদায় করা ইত্যাদি ফরয হওয়ার বিধান এবং একই সঙ্গে চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার, মদ্যপান, জুলুম, অন্যের হক নষ্ট করা, হারাম পন্থায় উপার্জন করা, হারাম কাজে খরচ করা ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিধান। তদ্রুপ কিছু বিধি-বিধানের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে। যেমন, সবর, শোকর, ইখলাস, যুহ্দ ইত্যাদি ফরয হওয়ার বিধান এবং হিংসা, অহংকার, রিয়া, লোভ, মোহ ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিধান।

উভয় প্রকার বিধানের উপর আমল করলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে। এ দু'প্রকার হতে কোন একটিও বাদ দিলে পূর্ণ মুসলমান হওয়া যাবে না। তবে আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিধানের গুরুত্ব এ হিসেবে বেশী যে, অনেক সময় বাহ্যিক আমল ঠিক হওয়া সত্ত্বেও আত্মা কলুষিত থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা সঠিক অর্থে পরিশুদ্ধ হলে বাহ্যিক আমলের দুর্বলতাও দূর হয়ে যায়। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো, আত্মার এই অদৃশ্য জগত– যার সাথে মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল, তা সম্পর্কে এবং তার বিধি-বিধান সম্পর্কে আমরা একান্তই উদাসীন। এ নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা-ফিকিরও নেই এবং পড়াশোনাও নেই। অথচ সঠিক তাছাওউফের চর্চা না থাকায় মানুষ আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় হিংস্র হায়েনায় পরিণত হয়েছে। লোভ-লালসা, স্বার্থান্ধতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মারাত্মক আত্মিক রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণভাবে ইসলামে দাখেল হওয়া।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থ "আত্মশুদ্ধি" উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর বয়ানের সংকলন دل کی دنیا বা রূহানী-জগত-এর বাংলারূপ। হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) এ কিতাবে আত্মশুদ্ধি ফরয হওয়ার বিষয়টিকে খুবই প্রাঞ্জল ও সহজ-সরল ভাষায় তুলে

ধরেছেন। এ কিতাব পাঠ করলে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তাই শুধু নয়, আত্মশুদ্ধি লাভের উপায় সম্পর্কেও একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। বর্তমান দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ, হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিত অশান্তির দাবানলে দগ্ধ সমাজে শান্তির সমিরণ প্রবাহিত করার এটাই একমাত্র পথ। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

এ মুহূর্তে আল মা'হাদুল ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল বিদগ্ধ আলেম ও উদীয়মান লেখক মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভীর শোকরিয়া আদায় করছি। কারণ তার প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী থেকেই এই মূল্যবান কিতাবখানা পেয়েছি।

বাংলাদেশের অন্যতম উচ্চতর গবেষণামূলক দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়ার হাদীছ বিভাগের প্রধান, আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, হযরত মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর তত্ত্বাবধানে উচ্চতর হাদীছ বিভাগের ছাত্র মাওলানা সাঈদ আহমাদ এ কিতাবে বর্ণিত সকল হাদীছের উদ্ধৃতি বের করে দিয়েছেন, সাথে সাথে হাদীছ সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতার দিকটিও যাচাই করেছেন এবং হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) যে সকল হাদীছের শুধু অর্থ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মূল হাদীছও তাঁরা খুঁজে বের করেছেন। তাদের উভয়ের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় আমরা হাদীছের মূলশব্দ আর কোন জায়গায় কেবলমাত্র তরজমা ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি।

সবশেষে তরুণ কলম সৈনিক ও দৃঢ়চেতা আলেম বন্ধুবর মাওলানা শরীফ মুহাম্মদেরও শোকরিয়া আদায় করছি। কারণ প্রচ্ছদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং ফাইনাল প্রুফ দেখে অনেক অসংগতি দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহপাক সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোন অসংগতি চোখে পড়ে, আমাদেরকে অবগত করলে আগামী সংস্করণে শুধরে নেবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক বইটিকে কবুল করে আমাদের নাজাতের উসীলা করুন। আমীন

বিনীত

২৩ শে জুমাদাল উলা
১৪২০ হিজরী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান
জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া
৩–৪, কোতোয়ালী রোড, তাঁতী বাজার
ইসলামপুর, ঢাকা–১১০০

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মুফতী, সাহিত্যিক, বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা, আধুনিক মাসআলা বিশ্লেষক এবং সম্পাদক ও কলামিষ্ট, জাষ্টিস

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী সাহেব

(দামাতবারাকাতুহুম)-এর মূল্যবান

অভিমত

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على رسوله الكريم

وعلى آله واصحابه اجمعين - اما بعد

রমযান মাসের কথা। কয়েকজন মুরুব্বী মিলে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর নিকট তাছাওউফের সংজ্ঞা ও তার মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা করার দরখাস্ত করলেন। আব্বাজান তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে প্রতিদিন ফজর নামাযের পর কখনো পনেরো-বিশ মিনিট, কখনো আধা ঘন্টা, কখনো এর চেয়েও কিছু বেশী সময় ধরে এ বিষয়ে বয়ান করতে আরম্ভ করলেন। আব্বাজানের এ বয়ান এতই মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয় ও উপকারী ছিলো যে, সেই বয়ানের শ্রোতামণ্ডলী আজও তার ভাবাবেগের স্বাদ স্মরণ করে থাকেন।

তাছাওউফ (মা'রেফাত) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কেউ তাছাওউফকে কুরআন-হাদীছের শিক্ষার পরিপন্থী বিষয় মনে করে এটাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আবার কেউ শরী'অতকে তাছাওউফের পরিপন্থী মনে করে শুধুমাত্র তাছাওউফকেই নাজাতের উপায় মনে করে শরী'অতের বিধানকে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয় না।

আব্বাজানের এ সকল বয়ানে তাছাওউফের আসল হাকীকত এমন সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, বাড়াবাড়িমূলক এ উভয়বিধ ধারণার মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। সাথে সাথে এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে সামনে এসেছে যে, তাছাওউফও দ্বীনের একটি অন্যতম শাখা এবং এ সকল বিষয়ই কুরআন-হাদীছ থেকে উদ্ভাবিত। এটা কুরআন-হাদীছের শিক্ষারই সারাংশ।

এ বয়ানসমূহকে সে সময় টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যেই আমি সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করি। আমার সম্পাদনায় যখন (দারুল উলূম করাচী থেকে) মাসিক "আল-বালাগ" বের হতে শুরু করে, তখন প্রতি মাসেই এর কিছু অংশ "দিল্ কি দুন্ইয়া" (রূহানী জগত) শিরোনামে প্রকাশ করতে থাকি। লিখিত কপি আব্বাজান দেখে কোন কোন জায়গায় কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেন।

আফসোস! আমি এ ধারা বেশী দিন অব্যাহত রাখতে পারিনি। পরে ঐ সকল ক্যাসেটও সংরক্ষিত হয়নি, যা থেকে এ বয়ানগুলো কপি করা হতো। কাজেই আমি অপেক্ষা করতে থাকি যে, আব্বাজান নিজেই হয়তো কোন সময় লিখে এ ধারাকে পূর্ণতায় পৌছে দিবেন। কিন্তু ব্যস্ততা ও অসুস্থতার দরুণ আব্বাজান এ কাজের জন্য সময় বের করতে পারেননি। এক সময় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। انا لله وانا اليه راجعون

এখন আমার ভাগিনাদ্বয় মৌলবী নাঈম আশরাফ এবং মৌলবী ফাহিম আশরাফ (سلمهما الله) সে সকল লিখিত বয়ানকে 'এদারাতুল কুরআন' নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও সে সকল বয়ানের বেশ কিছু অংশ লিখতে পারা যায়নি, কিন্তু তবুও যে সকল বিষয় এ সংকলনে এসেছে এগুলোও খুবই উপকারী। এ সংকলন দ্বারা কমপক্ষে তাছাওউফের সঠিক পরিচয় এবং মৌলিক বিষয়াবলী অবশ্যই বুঝে আসবে। তাছাড়া এ কিতাব পাঠ করলে নিজের আত্মশুদ্ধির চিন্তা-ফিকির জাগ্রত হবে।

অন্তর থেকে দু'আ করি– আল্লাহপাক এই সংকলনকে উপকারী বানান এবং আমাদের সবাইকে এ থেকে উপকৃত হয়ে নিজ নিজ আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

বিনীত

৯ই জিলক্বদ ১৪১৬ হিজরী

আহকার মুহাম্মদ তাকী উছমানী
দারুল উলূম, করাচী–১৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইলমে তাছাওউফ ও তার আলোচ্য বিষয়	১১
আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসাঃ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৬
তাছাওউফের হাকীকত	২১
আত্মার (বাতেনী) আমল	২৯
বাতেনী আমলের সংক্ষিপ্ত তালিকা	৩০
বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের ফরয ও ওয়াজিব	৩১
বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের হারাম বিষয়াবলী	৩১
জাহেরী এবং বাতেনী আমলের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য	৩১
আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা	৩২
বাতেনী আমল সংশোধনের জন্য ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর প্রস্তাব	৩৩
প্রথম পদ্ধতি ঃ কামেল পীরের অনুসরণ	৩৩
শয়তানের একটি ধোঁকা ও তার উত্তর	৩৩
শয়তানের আরেকটি ধোঁকা	৩৭
আউলিয়ায়ে কেরামের পরিচয়	৩৭
আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় পদ্ধতি	৩৮
আত্মশুদ্ধির তৃতীয় পদ্ধতি	৪০
আত্মশুদ্ধির চতুর্থ পদ্ধতি	৪২
প্রবৃত্তির চাহিদা ও তার প্রকারভেদ	৪২
প্রবৃত্তির চাহিদা দুই প্রকার	৪৪
মুজাহাদার (সাধনার) হাকীকত	৪৬
একটি দৃষ্টান্ত	৪৬
উলামায়ে কেরাম ও তালাবা সম্প্রদায়	৪৭
আত্মার গুণাবলী ও তার বিকাশ	৪৯
মাকামে মুহাব্বাত	৪৯
আল্লাহপাকের ভালবাসা লাভের উপায়	৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত থানভীর (রহঃ) একটি কাহিনী	৫১
ইমাম আবু দাউদের (রহঃ) উস্তাযের কাহিনী	৫২
হযরত তালহার (রাযিঃ) কাহিনী	৫২
মাকামে শওক ও উন্‌ছ	৫৪
মাকামে রেযা বিলক্বাযা	৫৫
আল্লাহপাক যে অবস্থায় রাখেন সেটাই ভাল	৫৬
এক রেল যাত্রীর কাহিনী	৫৭
শিশু কাহিনী	৫৭
যে সকল জিনিস অন্তরকে ধ্বংস করে	৫৯
সকল দোষের মূল	৬১
যবানের আপদসমূহ	৬৩
জিহবার প্রথম আপদ– অহেতুক কথা	৬৪
জিহবার দ্বিতীয় আপদ– অহেতুক বিতর্ক	৬৫
জিহবার তৃতীয় আপদ– ঝগড়া-বিবাদ	৬৭
মুজাহাদা বা সাধনা	৬৮
এ যুগের মুজাহাদা বা সাধনা	৭০
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা	৭২
আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ– তাওবা	৭৩
তাওবার তিনটি উপকরণ	৭৪
তাওবার প্রথম উপকরণঃ ইলম	৭৫
তাওবার দ্বিতীয় উপকরণঃ অনুশোচনা	৭৬
তাওবার তৃতীয় উপকরণঃ ক্ষতিপূরণ	৭৬
আত্মশুদ্ধির পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ সবর	৭৮
মাকামে সবর বা ধৈর্য ও তার প্রকারভেদ	৭৮
মাকামে শোকর	৮৫
মাকামে যুহ্‌দ (দুনিয়া বিমুখতা)	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুহ্‌দ এর তিনটি স্তর	৯২
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) এর কাহিনী	৯৩
এক বুযুর্গের কাহিনী	৯৪
যুহ্‌দের দৃষ্টান্ত	৯৫
মাকামে তাওহীদ	৯৬
অপূর্ব অভিযোগ	৯৮
মাকামে তাওয়াক্কুল	১০৩
তাওয়াক্কুল তিন প্রকার	১০৫
তাওয়াক্কুল এবং উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ প্রসংগ	১০৭
চমৎকার কাহিনী	১০৯
তদবীর ও দু'আর কাহিনী	১১২
দৈনন্দিন আমল ও আত্মশুদ্ধির সংক্ষিপ্ত সিলেবাস	১১৯
দৈনন্দিন আমলসমূহ	১১৯
কতিপয় মুস্তাহাব আমল	১২২
কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল	১২৩
সতর্কবাণী	১২৪
মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বাতেনী আমল	১২৬
সালেকের সমস্যা	১৩৫
জরুরী হেদায়েত	১৪০
খাতেমা বিলখাইর	১৪২
কতিপয় মাসনূন অযীফা	১৪৩
শাজারাহ	১৪৫
মাসনূন দু'আসমূহ	১৪৮
একটি ব্যাপক দু'আ	১৫২

আত্মশুদ্ধি

ইলমে তাছাওউফ ও তার আলোচ্য বিষয়

بسم الله الرحمن الرحيم

আমরা সকলেই মানুষ। মানুষ হওয়ার কারণে আমরা গর্ববোধ করে থাকি। কিন্তু কখনো কি আপনি চিন্তা করেছেন, মানুষ কাকে বলে? মানুষ কি এ গোস্ত, চামড়া, হাত, পা, নাক, কান এবং বাহ্যিক অবয়বের নাম? মানুষ শব্দটি কি কেবলমাত্র আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝানোর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে? যদি আপনি গভীরভাবে এ ব্যাপারে চিন্তা করেন, তাহলে এ সকল প্রশ্নের উত্তর না সূচকই পাবেন। কেননা বাস্তব অবস্থা এর পরিপন্থী। একথা বুঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি, এতে সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি বুঝে আসবে।

যেমন, জায়েদ একজন মানুষ। জীবদ্দশায় সে ধন-সম্পদ এবং জায়গা-জমির মালিক, নিজ স্ত্রীর স্বামী, নিজ অফিসের অফিসার, কাজেই তার অধীনস্থ লোকদের উপর তার হুকুম চলে। তার বয়ঃকনিষ্ঠরা তাকে ভয় করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার বক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস অবশিষ্ট আছে, ততক্ষণ তার অনুমতি ব্যতীত তার মাল নিয়ে কেটে পড়ার সাহস কারো হবে না। তার জমি-জায়গা দখলের সাহসও হবে না অথবা তার স্ত্রীকে বিয়ে করার সাহসও হবে না। যদি কেউ এমনটি করে, তাহলে, আইন জায়েদের পৃষ্ঠাপোষকতা করবে। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

কিন্তু যখনই শেষ নিঃশ্বাস তার মুখ দিয়ে বের হবে, তখন না সে মালের মালিক থাকবে! না জমি-জায়গার মালিক থাকবে; তার স্ত্রীও তার

থাকবে না, তার অধীনস্থরাও তার অধীন থাকবে না। অথচ তার লাশ এখনো সহীহ্-সালেম অবস্থায় তার বাড়ীতেই বিদ্যমান আছে। তা সত্ত্বেও তার সকল সম্পদ অন্যের মালিকানায় চলে গেছে। যে বাড়ী সে নিজের জন্য নির্মাণ করেছিলো, এখন তা অন্যের মালিকানায়। যে চাকর-বাকরের উপর সে হুকুম চালাতো, এখন তারা অন্যের হুকুমের অধীন।

যদি মানুষ এই চামড়া, গোস্ত তথা বাহ্যিক অবয়বের নাম হয়ে থাকে, তাহলে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে বিরাট পরিবর্তন, এটা কেন? কেমন করে সংঘটিত হলো? তার শরীরতো সেই পূর্বের শরীরই, তার শরীরেতো এখনো পূর্বের গোস্ত, চামড়া অবশিষ্ট আছে। তার শরীরে হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্বের মতোই লেগে আছে। কিন্তু এখন কেন তাকে কেউ মানুষ বলে না? এখন সে কেন মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত?

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেলো যে, 'জায়েদ' (নামক লোকটি) কেবলমাত্র গোস্ত, চামড়া সর্বস্ব বাহ্যিক অবয়বের নাম নয়। এখন প্রশ্ন হলো, কোন সে জিনিস– যা মানুষকে মানুষ বলার জন্য অপরিহার্য? আসুন আমরা অনুসন্ধান করি, জায়েদের লাশের মধ্যে কোন জিনিষের অভাব আছে, যার অনুপস্থিতির কারণে এখন আর তাকে মানুষ বলা হয় না? যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, 'জায়েদের' লাশের মধ্যে সবকিছুই আছে, নেই কেবলমাত্র একটি জিনিস, আর তাহলো তার "রূহ" (প্রাণ)। এ রূহের অভাবেই এ জায়েদ আর সে জায়েদ নেই, যে জায়েদ কোন এক সময় প্রাসাদ ও বাংলোর মালিক ছিলো, যার অধীনস্থদের উপর তার হুকুম চলতো।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে একথা স্পষ্ট যে, মানুষ কেবল গোস্ত, চামড়া এবং শরীরের নাম নয়, বরং শরীর এবং আত্মার (রূহের) সমষ্টির নাম হলো মানুষ। যতক্ষণ রূহের সম্পর্ক শরীরের সাথে থাকে, ততক্ষণই মানুষকে মানুষ বলা হয়। আর যখন রূহ (আত্মা) শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে আর মানুষ থাকে না, প্রাণহীন লাশে পরিণত হয়।

এ কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মানুষের মধ্যে দু'টি জগত। একটি হলো, শরীর বা বস্তু জগত, যা আমরা চোখে দেখে, হাতে ছুয়ে অনুভব করি। এ শারীরিক বা বস্তু জগতের সাথে একটি অদৃশ্য জগতও আছে, যা আমরা দেখতে পাই না এবং ছুইতেও পারি না। ঐ অদৃশ্য জগতেই রূহ বসবাস করে। ঐ গোপন জগতেই হৃদয়স্পন্দন হয়, ঐখানেই কামনা-বাসনা, আশা-আকাংখার জন্ম হয়, সেখানেই আনন্দ-বেদনার উদ্রেক হয়। ভালবাসা ও ঘৃণা, পরোপকারের স্পৃহা বা শত্রুতার বাসনা লালিত হয়। মজার কথা হলো, এ গোপন জগত– যেটা আমাদের চক্ষু দেখতে পায় না, এটাই মানুষের আসল জগত। যতক্ষণ পর্যন্ত এ জগতের নেজাম (ব্যবস্থাপনা) সচল থাকে, সে সময় পর্যন্তই মানুষ জীবিত থাকে এবং সে মানব সমাজে সকল মানবিক অধিকার ভোগ করে, কিন্তু যখনই এ নেজাম (ব্যবস্থাপনা) বন্ধ হয়ে যায়, তখনই মানুষকে মৃত বলা হয় এবং তার সকল অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এছাড়া যেমনিভাবে মানুষের বাহ্যিক দেহ কখনো সুস্থ থাকে কখনো রোগাক্রান্ত হয়। তদ্রুপ মানুষের আত্মাও (রূহও) কখনো সুস্থ থাকে, কখনো অসুস্থ হয়। যেরূপভাবে সর্দি, কাশি, জ্বর ও বিভিন্ন প্রকার ব্যাথা নামক মানুষের শারীরিক রোগ আছে, তদ্রুপ ক্রোধ, অহংকার, স্বার্থপরতা, আত্মশ্লাঘা, রিয়া (প্রদর্শনী ও লৌকিকতা) ইত্যাদি হলো রূহ বা আত্মার রোগ।

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, এজন্য মানুষের উভয়বিধ জীবনের প্রতি ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে। ইসলাম যেরূপভাবে আমাদের বাহ্যিক দেহ ও শরীর সম্পর্কে কিছু হেদায়েত (দিক নির্দেশনা) দিয়েছে, তদ্রুপ আমাদের আধ্যাত্মিক ও গোপন জগত সম্পর্কেও কিছু হুকুম বাতলে দিয়েছে। যেমনিভাবে ইসলাম আমাদের বাহ্যিক জীবনে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি উত্তম আমলসমূহ আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং কতিপয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে,

তদ্রুপভাবে আমাদের গোপন তথা আধ্যাত্মিক জীবনকে কতিপয় উত্তম গুণ দ্বারা সুসজ্জিত করার এবং কতিপয় দুশ্চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখার হুকুমও দেয়।

ইসলামের যে সকল বিধানের সম্পর্ক আমাদের বাহ্যিক বা জাগতিক জীবনের সাথে, সেগুলো ফিকাহ্ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আর যে সকল বিধান আমাদের আত্মার গোপন জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, তা ইলমে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয়।

সুতরাং ইলমে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয় হলো, আমাদের আত্মার ঐ জগত যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি দেখতে পায় না, কিন্তু ঐ গোপন জগতের সম্পর্ক আমাদের জাগতিক জীবনের সাথে খুবই মজবুত। এখন প্রশ্ন হলো, এ অন্তর বা দিল কি জিনিস? এ প্রশ্ন যদি ডাক্তার বা চিকিৎসককে করা হয়, তাহলে তারা এ উত্তর দিবে যে, অন্তর বলা হয় এমন একটি গোস্তের টুকরাকে যা মানুষের বক্ষের বাম পার্শ্বে ঝুলন্ত আছে এবং তার মাঝখানে কালো রঙ্গের জমাট রক্ত আছে। এই জমাট রক্তকে سويداء قلب (বা আত্মার কৃষ্ণতা) বলা হয়। এ গোস্তের টুকরা যখন রক্তকে পাম্প করে বাহিরের দিকে নিক্ষেপ করে তখন এক প্রকার আওয়াজ হয়, এই আওয়াজকে হৃদয়স্পন্দন বলে। তদ্রুপভাবে ডাক্তারদের মতে রূহ ঐ বাষ্প বা ষ্ট্রীমকে বলে, যা কলবের (অন্তরের) মধ্যে রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়ে রক্তনালীর মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তাছাওউফের পরিভাষায় যে জিনিসকে অন্তর এবং রূহ বলে তা এই বাহ্যিক রূহ এবং অন্তর হতে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তাছাওউফের পরিভাষায় "অন্তর" এবং "রূহ" এমন দুটি সুক্ষ্ম শক্তিকে বলা হয়, যা মানুষের স্রষ্টা মানুষের এই বাহ্যিক অন্তর ও রূহের সাথেই সৃষ্টি করেছেন। যেমনিভাবে চোখ দেখার, কান শোনার এবং হাত ছোয়ার শক্তি রাখে, তেমনিভাবে জমাট রক্তের এ টুকরা, যাকে অন্তর বলা হয়– সে কামনা-বাসনার শক্তি রাখে। তাছাওউফের পরিভাষায় অন্তর ঐ শক্তির নাম, যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চাহিদা ও কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে থাকে।

অন্তর এবং রূহের এই সুক্ষ্ম ও গোপন শক্তি আমাদের বাহ্যিক অন্তরের সাথে কোন ধরনের সংযোগ রাখে? এ দুয়ের মাঝে পরস্পরের সম্পর্ক কোন্ ধরনের? এর হাকীকত (প্রকৃত অবস্থা) আমাদের জানা নেই। আমরা কেবল এতটুকু জানি যে, এ দুয়ের মাঝে গভীর সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে সম্পর্ক কেমন? এটা কেবলমাত্র সেই আল্লাহপাকই জানেন, যিনি এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। যেমন, লোহা ও চুম্বকের মাঝে কি সম্পর্ক? চুম্বক তুলা এবং কাগজকে কেন নিজের দিকে আকর্ষণ করে না? তা আমরা জানি না, তদ্রুপভাবে আমরা এটাও জানিনা যে, অন্তর এবং রূহের এ গোপন শক্তি রক্তের ঐ টুকরার সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রাখে। এ কারণেই মুশরিক সম্প্রদায় যখন রূহের হাকীকত (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলো, তখন তার উত্তরে একথাই বলা হয়েছিলো যে,

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থাৎ, আপনি বলুন! এটি আমার প্রতিপালকের হুকুম মাত্র। (এর হাকীকত তোমরা জানতে পারবে না। কারণ) এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (বনী ইসরাঈল, ৮৫)

তাছাওউফ আমাদেরকে এতটুকু বলে যে, অন্তরের এ গোপন জগত, মানুষের বাহ্যিক জগতের ভিত্তি। এই গোপন জগতের উপরই মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। যদি অন্তরের এ জগত পরিশুদ্ধ হয় এবং এর ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে চলে, এ অন্তরে সঠিক কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়, সহীহ-শুদ্ধ চিন্তার উদ্রেক হয়, তাহলে মানুষটিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা হবে। আর যদি এ জগতের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে মানুষের বাহ্যিক জগতের ব্যবস্থাপনাও ব্যাহত হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাস্তব কথাটিকেই আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
فسد الجسد كله الا وهى القلب

অর্থাৎ, সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে, যদি এ গোস্তের টুকরাটি ভাল থাকে, তাহলে পূর্ণ শরীর ভাল থাকে। আর যদি এ গোস্তের টুকরাটি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাবধান! ঐ গোস্তের টুকরাটির নাম হলো, ক্বলব বা অন্তর। (সহীহ বুখারী ১ঃ১৩ সহীহ মুসলিম ২ঃ২৮)

অন্তর ভাল হওয়া বা নষ্ট হওয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এবং অন্তর কিসে ভাল আর কিসে নষ্ট হয়? এর রোগ কি কি? এ সকল রোগের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়? এটাই ইলমে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয়। এ সকল বিষয়কেই আমি একটু বিস্তারিতভাবে সামনে আলোচনা করতে চাই।

আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিগত মজলিসে এ কথা বলা হয়েছিলো যে, মানুষ শুধুমাত্র তার বাহ্যিক অবয়বের নাম নয়। বরং মানুষের আসল উপাদান হলো, তার অভ্যন্তর। যাকে ক্বলব (অন্তর) এবং রূহ (আত্মা) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া বুখারী শরীফে বর্ণিত সহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত করা হয়েছিলো যে, মানুষের বাহ্যিক আমল বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া এবং গঠন বা ধ্বংস হওয়াও এই অভ্যন্তরের গঠন ও ধ্বংসের উপর নির্ভরশীল।

আজকের মজলিসে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, দেহের বহির্ভাগ যেরূপভাবে কখনো সুস্থ থাকে, আবার কখনো অসুস্থ এবং শরীরের সুস্থতা ঠিক রাখার জন্য খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি উপকরণ অবলম্বন করা হয়, অসুস্থতা দূর করার জন্য ঔষধ-পত্র দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, তদ্রুপভাবে মানুষের অভ্যন্তর ভাগকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু উপকরণ অবলম্বন করা হয়, আর তাহলো স্বীয় খালিক (স্রষ্টা) ও মালিককে চিনা, তাঁর যিকির ও শোকর করা এবং সর্বদা তাঁর হুকুমের অনুসরণ করা। আর অভ্যন্তর ভাগের অসুস্থতা হলো, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা এবং তাঁর হুকুমের খেলাফ (পরিপন্থী) কোন কাজ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

অর্থাৎ, তাদের অন্তরে (কুফর ও অবাধ্যতার) রোগ আছে, সুতরাং আল্লাহপাক তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি করেছেন। (সূরা বাকারা, ১০ আয়াত)

আধ্যাত্মিক রোগ হলো– কুফর, শিরক, মুনাফিকী, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, গর্ব, লোভ, কৃপণতা, পদের মোহ, সম্পদের মোহ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। আর সুস্থতা হলো, স্বীয় মালিক আল্লাহপাককে চেনা, সকল লাভ ও ক্ষতি, সুখ ও দুঃখের মালিক আল্লাহপাককে মনে করা, তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা, যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, তাহলে ধৈর্য ধারণ করা। সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করা এবং আযাবের ভয় করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ফিকির করা, আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে তাঁর সকল হুকুম পালন করা। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপকরণ হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহপাক ইরশাদ করেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য (রোগের) সু-চিকিৎসা এবং রহমত হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল ৮২ আঃ)

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

অর্থাৎ, (হে নবী) আপনি বলে দিন, এই কুরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়েত এবং সুচিকিৎসা। (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪৪)

শারীরিক রোগ এবং আধ্যাত্মিক রোগের আরেকটি বড় পার্থক্য এই যে, শরীরের রোগতো চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। শিরার স্পন্দন, রক্ত ও মল-মূত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। বাহ্যিক বা শারীরিক রোগের চিকিৎসাও বিভিন্ন প্রকার অনুভবযোগ্য যন্ত্রপাতি ও ঔষধের মাধ্যমে করা হয়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক রোগ চোখেও দেখা যায় না, শিরা ইত্যাদির স্পন্দন দ্বারাও তা

বুঝা যায় না। তদ্রূপ এ রোগের চিকিৎসাও অনুভবযোগ্য খাদ্য-পথ্য ও ঔষধের মাধ্যমে হয় না। আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত নিয়মের মাধ্যমেই হতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে মানুষের বাহ্যিক আমল, লেন-দেন এবং আভ্যন্তরীণ আক্বীদা এবং আখলাক সবকিছুই সংশোধনের পরিপূর্ণ নিয়মাবলী বিদ্যমান আছে।

এ উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন হতে বর্তমান কালের কামেল বুযুর্গ পর্যন্ত, যার যা কিছু অর্জন হয়েছে, তা শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছের ঐ সকল নিয়মাবলীর উপর পরিপূর্ণ পাবন্দির সাথে আমল করার দরুণই অর্জন হয়েছে। এ সকল বুযুর্গ যেরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমলের প্রতি যথাযথ যত্নবান ছিলেন, তদ্রূপ সত্যবাদীতা, আমলী ইখলাস, বিনয়, ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি রূহানী আমলের প্রতিও যত্নবান এবং কামেল ছিলেন। তাঁরা যেমন মিথ্যা, ধোঁকা, চুরি, বেহায়াপনা ইত্যাদি গোনাহকে ভয় করতেন এবং তা থেকে বিরত থাকতেন, তদ্রূপ অহংকার ও গর্ব, অপরকে অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করা, পদের মোহ ও সম্পদের মোহ, লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক রোগ এবং গোনাহকেও হারাম মনে করে তা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেন।

উলামায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত সকল বিধানকে কয়েকটি ইলম ও ফণরূপে (বিদ্যা ও বিষয়ে) পৃথকভাবে সংকলন করে দিয়েছেন। দৈহিক ও বাহ্যিক আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ,তালাক এবং সকল প্রকার লেন-দেন ও চুক্তিকে 'ইলমে ফিকাহ' রূপে। আর বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক আমলসমূহের মধ্য হতে 'আকাইদ'কে 'ইলমে আকাইদ' রূপে এবং আখলাক ও ইসলামী সামাজিক বিধি-বিধানকে 'ইলমে তাছাওউফ' রূপে সংকলিত করেছেন।

কোন কোন আলেম উপরোক্ত তিনটি ইলমকেই একত্রে সংকলন করেছেন। আল্লামা ইবনুস সুবকী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'জামউল

জাওয়ামে' (جمع الجوامع) এর শেষাংশে (এটি উসূলে ফিকাহ্র বিখ্যাত কিতাব) তাছাওউফ, আখলাক তথা আভ্যন্তরীণ আমলের ব্যাখ্যা করেছেন।

হযরত ইমাম কুশাইরী (রহঃ) 'রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ' নামক গ্রন্থে হযরত সাহরোওয়ার্দী (রহঃ) 'আউয়ারেফুল মা'আরেফ' নামক গ্রন্থে, ইমাম গাযালী (রহঃ) 'ইহইয়াউ উলূমিদ্ দ্বীন' ও অন্যান্য স্বতন্ত্র গ্রন্থে বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) আমলের সংশোধন ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আর শেষ যমানায় সাইয়্যেদী হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এ বিষয়ে 'আত্তাকাশ্শুফ', 'আত্তাশার্রুফ' 'মাসায়েলুস্ সুলূক' 'তা'লীমুদ্দীন', 'কছদুস্সাবীল' ইত্যাদি কিতাবে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু দীর্ঘ দিন হতে দ্বীন ও দ্বীনী ইলম থেকে চরম বিমুখতার কারণে এ ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে মারাত্মক অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে 'ইলমে তাছাওউফ' –যার সম্পর্ক বাতেনী আমলের সাথে তা এমনভাবে বর্জন করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষতো পরের কথা, উলামায়ে কিরামেরও একটি বড় অংশ এ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছে। শুধুমাত্র বাহ্যিক আমলের মধ্যেই দ্বীন ও শরী'অতকে সীমাবদ্ধ মনে করা হচ্ছে। সত্যবাদিতা ও ইখলাস, তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল, ধৈর্য ও শোকর, অল্পে তুষ্টি ও দুনিয়া-বিমুখতা এবং তাকওয়ার নামটাই শুধু এখন মুখে আছে। পদের লোভ, সম্পদের লোভ, অহংকার ও গর্ব, রাগ ও ক্রোধ এবং হিংসা-বিদ্বেষের মত ধ্বংসাত্মক ও হারাম রোগসমূহ থেকে নাজাত লাভের চিন্তাও অন্তর থেকে দূর হয়ে গেছে।

আমার এ আলোচনা সর্ব প্রথম আমার নিজের উদ্দেশ্যে, অতঃপর অন্যান্য উলামায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে। আমরা আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও আমলকেতো কিছুটা শরী'অত মুতাবিক বানিয়েছি। দৈহিক আমলের দিক দিয়ে আমাদেরকে শরী'অতের অনুসারী মনে করা হয় এবং আমরা এমন সকল গোনাহ থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করে থাকি, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উলামায়ে কিরামের সম্মানের পরিপন্থী মনে হয়। কারণ

যারা এ সকল গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তারা জনসাধারণের দৃষ্টিতে হীন হয়ে যায়। কিন্তু আত্মার গোনাহ– যা মারাত্মক ধরনের হারাম এবং কবীরাহ গোনাহ, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব এবং চেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না।

এ ক্ষেত্রে নিজের মনকে একটি প্রশ্ন করা দরকার যে, আমাদের নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত এবং চুরি, বদমাশি, বেহায়াপনা, সিনেমা ও হারাম খেলাধুলা দর্শন থেকে বিরত থাকাটা যদি সত্যিকার অর্থে আখিরাতের ফিকির এবং আল্লাহর ভয়ে হয়ে থাকে, তাহলে এর কি কারণ যে, উপরোক্ত গোনাহসমূহের চেয়েও মারাত্মক ধরনের গোনাহে আমরা লিপ্ত হয়ে যাই? এতে আমাদের মাঝে আখিরাতের ফিকিরও জাগে না, আল্লাহর ভয়ও সৃষ্টি হয় না।

এমনতো হচ্ছে না যে, আমাদের এ সকল বাহ্যিক আমল আল্লাহপাকের জন্য খালেস না হয়ে আমাদের পেশাদারী মনোবৃত্তির জন্যই হচ্ছে? এ সকল আমলের সম্পর্ক আল্লাহ এবং আখিরাতের সাথে না থেকে, বরং আমাদের পেশার সাথে থাকছে? কারণ যদি নামায, রোযা ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়া হয় অথবা বাহ্যিক হারাম কাজে লিপ্ততা প্রকাশ পায়, তাহলে ইমামতি, খেতাবাত, শিক্ষা-দীক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের যে পদ আমাদের লাভ হয়েছে, তা ছুটে যাবে। কাজেই আমরা শুধু ঐ সকল বাহ্যিক গোনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি, যা আমাদের জুব্বা, পাগড়ী ও পেশার দ্বারা লুকানো যায় না। পক্ষান্তরে বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) ঐ সকল গোনাহ– যার উপর আমাদের জুব্বা, পাগড়ীর পর্দা ঝুলানো যায়, তাকে আমরা মাতৃ দুগ্ধের ন্যায় মনে করে নিয়েছি।

আজ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, দাওয়াত ও তাবলীগ যা একেবারে নিষ্ক্রিয় প্রায় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ফেতনা ও ঝগড়ার উৎস, এর একমাত্র কারণও আমাদের এই জঘন্য মনোবৃত্তি। انا لله وانا اليه راجعون

বাস্তব অভিজ্ঞতা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ায় কেবলমাত্র ঐ সকল লোকের তা'লীম ও তাবলীগ, ইসলাহ (সংশোধন) ও তারবিয়্যত (দীক্ষা) এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অক্ষুণ্ন রয়েছে, যাদের অন্তঃকরণ ও হৃদয়

তাকওয়া এবং আল্লাহর ভয় ও ইখলাসে পরিপূর্ণ ছিলো। অপরদিকে দুনিয়া জোড়া বিখ্যাত বহু বড় বড় গবেষকদের (মুহাক্কিকদের) নাম নিশানাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট হিদায়েত, তাকওয়া, ক্ষমা ও স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। আমীন।

তাছাওউফের হাকীকত

বিগত মজলিসসমূহের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে ভেতর এবং বাহির তথা দেহ ও আত্মার সমষ্টির নাম। কুরআন ও হাদীছ শরীফে মানুষের সংশোধন ও সাফল্যের পরিপূর্ণ বিধানের যে কথা বলা হয়েছে, তার সম্পর্ক মানুষের দেহ এবং আত্মা উভয়ের সাথে। মানুষের সুবিধার জন্য বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আহকাম যেমন, ইবাদাত, বিবাহ, তালাক, লেন-দেন, চুক্তি-পত্র ইত্যাদিকে 'ইলমে ফিকাহ' নামে সংকলিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষের অভ্যন্তর তথা আত্মা ও রূহের সাথে সম্পৃক্ত আহকামসমূহ যেমন, আকাইদ ও আখলাককে 'ইলমে আকাইদ' ও 'ইলমে তাছাওউফ' নামে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংকলিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল কিছুই কুরআন ও হাদীছের শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন শাখা। এগুলোর প্রতিটিকে অপরটি থেকে পৃথক এ অর্থে বলা যায়, যেমন, হাত পৃথক অঙ্গ, পা পৃথক অঙ্গ, চোখ, কান, নাক, অন্তঃকরণ, কলিজা, পাকস্থলী ইত্যাদি পৃথক অঙ্গ। কিন্তু পূর্ণ মানব দেহ এ সবগুলোর সমন্বয়েই গঠিত। যেরূপভাবে এ সকল অঙ্গের কোন একটিকে নিয়ে আর অপরটিকে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না এবং এর কোনটিই অপর অঙ্গের বিরোধী নয়। একটির ক্রিয়া-কর্ম অপরটির ক্রিয়া-কর্মের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়, তদ্রূপভাবে 'ইলমে আকাইদ', 'ইলমে ফিক্হ', 'ইলমে তাছাওউফ' যদিও পৃথক পৃথক ইলম ও বিষয়, কিন্তু কেবলমাত্র এ সকল বিষয়ের প্রতিটির সমষ্টির উপর আমল করার দ্বারাই কামেল মুমিন ও মুসলিম হওয়া যায়।

উপরোক্ত সকল বিষয়ের উপর আমল করার দ্বারাই কুরআন-হাদীছের অনুসরণ ও অনুকরণের সৌভাগ্য লাভ হয়। এগুলোর কোন একটিকে গ্রহণ করে অপরটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা এমনই ধ্বংসাত্মক, যেমন, কেউ কান হিফাজত করলো কিন্তু চক্ষুকে ধ্বংস করে দিলো। ফিকাহকে তাছাওউফের কিংবা তাছাওউফকে ফিকাহ্‌র পরিপন্থী মনে করা, কানকে চোখের পরিপন্থী মনে করারই নামান্তর। যে সকল লোককে আল্লাহ্‌পাক কুরআন ও হাদীছের এ সকল বিষয়ের উপর এক সাথে আমল করার তাওফীক দিয়েছেন, কেবলমাত্র তারাই এ সকল বিষয়ের হাকীকত অনুধাবন করে থাকেন। এ শ্রেণীর মহান বুযুর্গদের বক্তব্য থেকেই এ ইলম ও বিষয়ের সঠিক পজিশন ও মর্যাদা জানা যাবে।

হযরত শাহ অলীউল্লাহ (রহঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

'তরীকত (তথা তাছাওউফ) বিহীন শরী'অত একান্তই একটি দর্শন। আর শরী'অত বিহীন তরীকত ধর্মহীনতা ও খোদাদ্রোহীতা বৈ নয়।'

হযরত শাহ্ অলীউল্লাহ্ (রহঃ) এই একটি বাক্যের মাধ্যমেই ঐ ইলম ও ফুনূনের (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের) পূর্ণ হাকীকত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক আমল সম্পর্কে ইলমতো অনেক মুনাফিকেরও ছিলো, আজো শত শত ইয়াহুদী, নাসারা ও নাস্তিক এমন আছে, যারা ইসলামী ইলমের ক্ষেত্রে খুবই গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু এটা শুধুমাত্র দর্শন, দ্বীন নয়। দ্বীন বলে তখনই গণ্য হবে, যখন তার বিধানসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তার শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মা সম্বন্ধীয় আহকামের উপর আমলও করা হবে। এজন্যই কেবলমাত্র বাহ্যিক ইলম সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং গবেষণাধর্মী আলোচনাকে কোন দ্বীনী যোগ্যতা বলা হয় না। তাছাড়া আল্লাহ্‌পাক ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও এর কোন মূল্য নেই।

তদ্রুপ তরীকত ও তাছাওউফের নাম নিয়ে কেউ যদি শরী'অতের বিধানের খেলাফ চলে, তাহলে এটাকেও নাস্তিকতা এবং কুরআন-হাদীছের বিকৃতি বলেই আখ্যায়িত করা হবে।

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) বলেন ঃ যার জাহের (বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) পাক নয়, (অর্থাৎ শরী'অতের হুকুমের অধীন নয়) তার বাতেন (অভ্যন্তর অর্থাৎ, তার অন্তঃকরণ) কখনো পবিত্র হতে পারে না।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম সুফিয়ায়ে কিরামের শাইখ ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী (রহঃ) 'রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ্র' নামক একটি বিস্তারিত পয়গাম তৎকালীন মাশাইখদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। পরবর্তী যুগে এ বিষয়ে যত কিতাব রচিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোর ভিত্তি এ রিসালাহ্। এ রিসালাহ্র ভূমিকায় সুফিয়ায়ে কিরামের ইমামদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তরীকত শরী'অত থেকে পৃথক কোন জিনিস নয়, বরং শরী'অত ও সুন্নাতের উপর পুরোপুরি আমল করার নামই তরীকত। উক্ত কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে লিখা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মে নবুয়ত ও রিসালাতের পর সবচেয়ে বড় ফযীলতপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত (সান্নিধ্য)। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যে সকল মহান লোকের হয়েছে, তাদের সবচেয়ে বড় ফযীলত ও উপাধী হলো, 'সাহাবী' (যা সোহবত-সংশ্রব শব্দ হতে নির্গত)।

সাহাবায়ে কিরামের পর যারা তাদের সোহবতে থেকে ইলম ও আমল হাসিল করেছেন, তাঁদের সবচেয়ে বড় সম্মানসূচক উপাধী হলো, 'তাবেয়ী' (অর্থাৎ অধীনস্থ বা অনুসারী)। আর তাদের পরবর্তীদের জন্য 'তাবে তাবেয়ী' নির্ধারিত হয়েছে (অর্থাৎ, অধীনস্থদের অধীনস্থ বা অনুসারীদের অনুসারী)।

এ সকল মহান ব্যক্তিত্ব শরী'অত ও সুন্নাতের উপর পূর্ণভাবে আমলকারী ছিলেন। কিতাব ও সুন্নাহ্র নির্দেশিত সকল প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমল দ্বারা সজ্জিত ছিলেন। শরী'অত ও তরীকতের বাস্তব আমলদার ছিলেন। এ সকল লোকের শ্রেণী বিন্যাস ও উপাধী কোন ইলম ও বিদ্যার ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে নির্ধারণ করা হয় নাই, বরং তাদের উপাধী দেওয়া হয়েছে 'সাহাবী,' 'তাবেয়ী,' 'তাবে তাবেয়ী'

ইত্যাদি। তাঁদের পরবর্তী কালের লোকদের কর্ম পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যাওয়ায় কেউ শিক্ষা-দীক্ষার কাজে, কেউবা লিখনী ও রচনার কাজে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাতেনী ইলম ও আমলে তাদের পূর্ণ দখল ছিলো। তবে অন্য কাজে ব্যস্ততার দরুণ এদিকে লিপ্ততা কিছুটা কম হয়ে যায়। তারা জাহেরী ইলমের ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে আলেম, মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির এবং ফকীহ বলে আখ্যায়িত হন। অপরদিকে কিছু সংখ্যক লোক যারা আমল ও ইবাদতের দিকে খুব বেশী ঝুকে পড়েন, তাদেরকে ইবাদতকারী (عباد) এবং দুনিয়া বিমুখ (زهاد) বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ সকল বুযুর্গ ইবাদত বন্দেগীতে সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকলেও উলূমে জাহেরী শর'য়ী (অর্থাৎ, শরী'অতের বাহ্যিক আমল সম্পর্কিত ইলমের) দিক দিয়েও অনগ্রসর ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীতে এই আবেদ ও জাহেদ শ্রেণীর মধ্যে এমন কিছু ভন্ড প্রতারক ঢুকে পড়ে, যারা শরী'অত ও সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও ফের্কা তৈরী হয়। প্রতিটি ফের্কার মধ্যেই কিছু লোক ইবাদতকারী এবং জাহেদ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে সময় যে সকল মহামনীষী আহলে সুন্নাতওয়াল জামা'আতের আক্বীদার উপর কায়েম থেকে শরী'অত ও সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার সাথে সাথে ইবাদত-বন্দেগী, মুজাহাদা ও বাতেনী আমলের ক্ষেত্রেও পূর্ণতা লাভের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন, তাদেরকে 'তাছাওউফপন্থী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বে এ সকল আকাবির মাশায়েখ "আহলে তাছাওউফ" (বা তাছাওউফপন্থী) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। এদের সকলেই জাহেরী শরী'অত ও সুন্নাতের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার সাথে সাথে নিজ জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসেরও হেফাজত করতেন এবং আল্লাহপাকের যিকিরে লিপ্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং অলসতা ও গাফলতী থেকেও বেঁচে থাকতেন। ইমাম কুশাইরী (রহঃ) তাদের সম্পর্কে লিখেছেনঃ

ثم ظهرت البدع وحصل التداعى بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا فانفرد خواص اهل السنة المراعون انفاسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لهئولاء الأكابر قبل المأتين من الهجرة - (رساله قشيرية صـ٨)

অর্থাৎ, অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে বিদ'আতের প্রচলন ঘটে। সকল ফির্কাই একথা বলে যে, তাদের গ্রুপেও দরবেশ আছে, (অন্য) লোকদের নিজেদের প্রতি ডাকতে থাকে এবং বলে যে, এ সকল দরবেশের খেদমতে হাজির হও। এ সময় (ভাল-মন্দ) পার্থক্য করার জন্য আহলে সুন্নাতের ঐ সকল বিশেষ লোককে আহলে 'তাছাওউফ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যারা আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে নিজের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হিফাজত করে থাকেন এবং গাফলতী ও সর্ব প্রকার কু-ধারণা থেকে স্বীয় ক্বলবকে হিফাজত করেন। তছাওউফ শব্দটির সাথে এ ধরনের লোকদের নাম হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে যুক্ত হয়ে যায়। (রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ্ ৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা কুশাইরী (রহঃ)-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, 'আহলে তাছাওউফ' (তাছাওউফপন্থী) এবং সুফী নামে পূর্ব যুগে কেবলমাত্র ঐ সকল লোকই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, যারা শরী'অত ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী এবং বিদ'আত ও কু-প্রথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র যুহ্‌দ ও রিয়াযত পালনকারী এমন লোক, যারা সুন্নাতের অনুসারী নয়, তারা এ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো না। বরং এ সকল লোকদের থেকে পার্থক্য করার জন্যই এ নাম রাখা হয়েছে। উলামায়ে কিরাম ও সুফিয়ায়ে কিরামের গুণাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র এ পার্থক্য ছিলো যে, নবুওতের সময়ের পর মানুষের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাওয়ায় জাহেরী এবং বাতেনী আমলের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করা এবং একই সময়ে উভয়টিতে পরিপূর্ণভাবে লিপ্ত হওয়া সম্ভব না হওয়ায়, উলামায়ে কেরাম শিক্ষা-দীক্ষা, রচনা ও ফতোয়ার কাজকেই নিজেদের

কর্মক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করে এজন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে সুফিয়ায়ে কেরাম বাতেনী আমল ও আত্মার সংশোধনের মাধ্যমে এবং এদিক দিয়ে মুসলমানদের ইসলাহ্ ও পথ প্রদর্শনকে নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তারা খানকাহ তৈরী করেন। এটা কেবলমাত্র কর্ম বন্টনের একটি পদ্ধতি ছিলো। পরস্পর মতবিরোধ ও অনৈক্যের কোন দিক এতে ছিলো না। কারণ মাদ্রাসার লোকেরা তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে গাফেল ছিলেন না। অপরদিকে খানকার লোকেরা বাহ্যিক আমলের দিক দিয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না এবং এর গুরুত্ব তাদের কাছে কম ছিলো না।

কিন্তু কালের ঘুর্ণাবর্তও কত রকমের খেলা দেখায়। কালক্রমে উভয় শ্রেণীর মধ্যে অভিজ্ঞ মুহাক্কেকের অভাব শুরু হয়ে গেলো। ফলে একদিকে উলামায়ে কিরামের মধ্যে আল্লাহর যিকির ও আখিরাতের ফিকির থেকে গাফলতির বিষ ঢুকে পড়লো। পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহ্পাক ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ধরনের গভীর প্রেম ও ভালবাসা আবশ্যক, তাতে স্বল্পতা দেখা দিলো। অপরদিকে পীর-দরবেশ সূফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে শরী'অতের ইলমের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও স্বল্পতার বিষ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে সুন্নাত ও শরী'অতের গুরুত্বের ব্যাপারে মারাত্মক অবহেলা দেখা দিলো। যার দরুণ মাদরাসা ও খানকাসমূহ একে অপরের শত্রুতে পরিণত হলো। এক পক্ষ অপর পক্ষকে দোষারোপ করতে লাগলো। মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কেবলমাত্র সামান্য কিছু মাসায়েল জানাকেই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মনে করতে লাগলো। পক্ষান্তরে খানকাহ্র সাথে সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবর্গ কেবল কিছু তাছবীহ ও নফল আদায়কে যথেষ্ট মনে করতে লাগলো। মাদরাসাসমূহে বাতেনী আমলের অভাব আর খানকাহসমূহে শরী'অত ও সুন্নাতের উপর আমলের অভাব প্রচন্ডরূপে দেখা দিলো। এমনকি 'তাছাওউফ' বলতে এমন কিছু রসম-রেওয়াজকে (প্রচলন) বুঝানো হলো, যার সাথে শরী'অত ও সুন্নাতের কোন সম্পর্কই নেই।

এই মতবিরোধের ফলে মারাত্মক দু'টি ক্ষতি উম্মতের জন্য হলো। প্রথমতঃ এই দুই সম্প্রদায় যারা মুসলমানদের সংশোধনের ব্যাপারে

জিম্মাদার বলে গণ্য হতো, তাদের নিজেদের অভিযুক্ত হওয়াটা একটা মারাত্মক ও দুঃখজনক ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ এ দুই গ্রুপের মারাত্মক মতবিরোধ এবং এক গ্রুপ অপর গ্রুপকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা যা মুসলমানদের ঐক্য ও একতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।

এই দলাদলী ও মতবিরোধের সবচেয়ে মারাত্মক ফল এই হলো যে, মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি শ্রেণী তৈরী হলো, যারা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর প্রতিই মারাত্মক ধরনের বিদ্বেষী ছিলো এবং উভয়ের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গেলো। অথচ তাদের নিজেদের এমন কোন ইলমী ও আমলী যোগ্যতা ছিলো না, যাতে তারা উপরোক্ত দুই শ্রেণী থেকেই দায়মুক্ত হয়ে সরাসরি নিজেরা কুরআন-সুন্নাহ্‌র শিক্ষাকে পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করে সঠিকভাবে আমল করবে। আর যাদের মাধ্যমে তারা কুরআন-সুন্নাহ্‌র এ অমূল্য রত্ন-ভান্ডার থেকে উপকৃত হতে পারতো, তাদের প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষের ফলে তাদের অবস্থা ঐ রোগীর মত হলো, যে নিজেতো নিজ রোগের চিকিৎসা জানে না, তাসত্ত্বেও দেশের সকল ডাক্তার ও হাকীমের প্রতি অসন্তুষ্ট। ফলে ঐ সকল লোকেরা 'ইলমে দ্বীন' হাসিল করার জন্য স্বীয় বিদ্বেষের দরুণ অভিজ্ঞ মুহাক্কেক উস্তাযের শরণাপন্ন হওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র দ্বীনী কিতাবাদি অধ্যয়নের উপরই নির্ভর করলো। ফলশ্রুতিতে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অনেক মাসায়েলের ব্যাপারে এমন পথ অবলম্বন করলো, যা উম্মাতের নির্ভরযোগ্য ও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বর্ণিত পথ থেকে ভিন্নতর ছিলো। এভাবে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনের মধ্যে বিকৃতির একটি নতুন পথ খুলে গেলো। এদের মধ্য হতে কতিপয় লোক উলামায়ে কেরামকে ঠাট্টা-উপহাস, হাসি-বিদ্রুপ ও অহেতুক অভিযোগের নিশান বানিয়ে নিলো। আর কতিপয় লোক সুফিয়ায়ে কেরামকে নিশানা বানালো। আর কেউ কেউ উভয় শ্রেণীকেই নিজেদের অভিযোগ ও অপমানের নিশানা বানিয়ে নিলো।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে আল্লাহপাক বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশে এমন বান্দা সৃষ্টি করেন, যারা এই মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণসমূহ সঠিকরূপে চিহ্নিত করে, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যথার্থ

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তারা দ্বীনের সার্বিক সংস্কার সাধন করে উভয় গ্রুপের সংশোধন করে থাকেন। শেষ যমানায় আল্লাহপাক 'মুজাদ্দিদে আলফে ছানী' এবং হিন্দুস্থানে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর মাধ্যমে এই খিদমতের বিরাট অংশ আঞ্জাম দিয়েছেন। পরিশেষে হিন্দুস্থানের যে সকল মহামনীষীর হাতে আল্লাহপাক দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়েছেন, তাদের সকলেই যেরূপ শরী'অতের ইলমের দিক দিয়ে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন, তদ্রুপ ইলমে বাতেনী তথা তাছাওউফের ক্ষেত্রেও উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। তারা দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি মাদরাসা ও খানকাহ্‌র সমন্বয়ে রেখে ছিলেন।

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন সাহেব (রহঃ)ও দারুল উলূম দেওবন্দ সমসাময়িক। যে বৎসর দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, সে বৎসরই আমার পিতা জন্ম গ্রহণ করেন। আমার আব্বা বলতেনঃ "আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের সেই (স্বর্ণ) যুগও দেখেছি, যখন মুহতামিম ও প্রধান শিক্ষক থেকে নিয়ে চাপরাশি এবং দারোয়ান পর্যন্ত সকল কর্মচারীই 'সাহেবে নিসবত' (আল্লাহ্ পাকের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনকারী) অলীআল্লাহ্ ছিলেন। যে দারোয়ান গেটে প্রহরীর কাজ করতো, সেও সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের যিকিরে লিপ্ত থাকতো। দিনের বেলায় মাদ্রাসার ক্লাশ রুম এবং ছাত্রদের থাকার কামরা থেকে ইলমী আলোচনার আওয়ায শোনা যেতো। কিন্তু রাতের বেলা সব জায়গা থেকেই কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহপাকের যিকিরের হৃদয়গ্রাহী আওয়ায শোনা যেতো।

শুরুতে দারুল উলূমের অভ্যন্তরে কোন মসজিদ ছিলো না। ছাত্র-শিক্ষকগণ আশে-পাশের মসজিদে নামায আদায় করতেন। আমার পাঠ্যাবস্থায় দারুল উলূমের অভ্যন্তরে নিজস্ব মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ঐ মসজিদের ঐতিহাসিক ফলকে সাইয়্যেদী শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তি লিখেছিলেন।

در مدرسه خانقاه دیدیم

(অর্থাৎ মাদ্রাসায় আমরা খানকাহ দেখেছি।)

কবিতার এই পংক্তিতে দারুল উলূমের মূল প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে, যার উপর দারুল উলূমের ভিত্তি রাখা হয়েছিলো। যার দরুন ইলমে শরী'অত ও তাছাওউফের এমন পবিত্র ফলাফল প্রকাশ পেলো যে, এখান থেকে পাশ করা শত-সহস্র আলেম, মানুষের পথ প্রদর্শক হয়ে নিজ নিজ এলাকার মানুষের মধ্যে দ্বীনী চেতনা জাগ্রত করে এবং বিদ'আত ও অলসতার মারাত্মক তুফানের মোকাবিলা করে সফল দা'য়ীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন।

এদের মধ্যে এমন কিছু আকাবির তৈরী হন, যাদের প্রত্যেকেই হিদায়েতের নূরানী সূর্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে স্বীয় আলোকে উদ্ভাসিত করেন। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহঃ) এবং হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর দৃষ্টান্তই একথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

আত্মার (বাতেনী) আমল

পূর্ববর্তী মজলিসসমূহে বার বার একথা বলা হয়েছে যে, ইসলামের আহকাম দুই প্রকার। প্রথম প্রকার, যার সম্পর্ক মানুষের শরীর তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, সদকা, বিবাহ, তালাক, মিরাছ, ব্যবসা ও ইজারা-চুক্তি, সামাজিকতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার, যার সম্পর্ক মানুষের আত্মা ও রূহের সাথে। যেমন, ঈমান, ইখলাস, তাওহীদ, সত্যবাদীতা, আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত, আযমত, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, অল্পে তুষ্টি, দুনিয়া-বিমুখতা ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার বর্ণনা ফিকাহ্‌র কিতাবে করা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার বর্ণনা আখলাক ও তাছাওউফের কিতাবে করা হয়। প্রথম প্রকার যেরূপ দ্বীনের বিধান এবং ইসলামের অন্যতম নিদর্শন, তদ্রুপ বরং তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব ইসলামী শরী'অতে দ্বিতীয় প্রকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বা শয়তানের ষড়যন্ত্র, যা-ই বলা হোক না কেন, মুসলমানদের মধ্যে এমনকি দ্বীনদার শ্রেণীর

লোকেরাও কেবলমাত্র প্রথম প্রকারের আহ্‌কামকেই ইসলাম মনে করে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের তথা আত্মা সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সাথে এমন উন্নাসিকতা প্রকাশ করা হয় যেন ইসলামী শরী'অতে এর কোন প্রয়োজন ও গুরুত্বই নেই। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা; উলামায়ে কিরাম, তালাবায়ে ইলমেদ্বীনের মধ্যেও বাতেনী আমল অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে মারাত্মক পর্যায়ের নিশ্চিন্ততা ও অলসতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ কারণেই এই মজলিসের আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে শুধুমাত্র বাতেনী আমল অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির উপায়কে।

বাতেনী আমলের সংক্ষিপ্ত তালিকা

যেরূপভাবে জাহেরী তথা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত আমলসমূহের মধ্যে কিছু জিনিস ফরজ, কিছু ওয়াজিব এবং কিছু মুস্তাহাব আছে, যা আদায় করলে অনেক সওয়াব হয় আর অমান্য করলে মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে। সাথে সাথে কিছু জিনিস হারাম, নাজায়েয এবং মাকরূহ আছে। যা করলে মারাত্মক শাস্তির ধমকি এসেছে। আর এ সকল নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগ করলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যাবে। তদ্রুপভাবে বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের ক্ষেত্রেও ফরয, ওয়াজিব আছে। এগুলোকে فضائل (ফাযায়েল) তথা গুণ বলা হয়। আর কিছু জিনিস আছে হারাম ও নাজায়েয। যাকে رذائل (রাযায়েল) তথা দোষ বলা হয়। ঐ সকল ফাযায়েল (গুণাবলী) ও রাযায়েলের (দোষসমূহের) সংক্ষিপ্ত তালিকা আজকের মজলিসে পেশ করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ আগামী মজলিসে করা হবে।

বাতেনী আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈমান ও তার সাথে সম্পৃক্ত আক্বায়েদ। এগুলো এমন অত্যাবশ্যকীয় যে, এগুলো ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমানই হতে পারে না। ঈমান ও আকায়েদ সম্পর্কিত আলোচনা যেহেতু ভিন্নভাবে 'ইলমে আকায়েদে' করা হয় এবং এটা মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত তাই এ মজলিসে এ বিষয়ে আলোচনা না করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের ফরয ও ওয়াজিব

তাওবা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্র রহমতের আশা, আল্লাহ্র ভয়, যুহ্দ, (তথা দুনিয়া বিমুখতা) আমলী তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, মুহব্বত, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি, ইখলাস, আমলী সত্যবাদিতা। এগুলো পারিভাষিক শব্দ। এর ব্যাখ্যা এবং তা অর্জন করার উপায় আগামীতে বলে দেওয়া হবে।

বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের হারাম বিষয়াবলী

কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা, যবানের দোষসমূহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা, দুনিয়ার মুহাব্বত, কৃপণতা, লোভ, পদের মোহ, রিয়া (প্রদর্শনী-লৌকিকতা) অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। এগুলোও পারিভাষিক শব্দ। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় আগামীতে আলোচনা করা হবে।

জাহেরী এবং বাতেনী আমলের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য

বিগত কোন এক মজলিসে বলা হয়েছিলো যে, জাহেরী এবং বাতেনী আমলের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, জাহেরী আমল চোখে দেখা যায়। যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল চোখে দেখা যায়। তদ্রুপ জাহেরী নিষিদ্ধ কর্মসমূহ, যেমন, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা, গীবত, চরিত্রহীনতা, বিলাস-ব্যসন ইত্যাদিও অনুভব করা যায়। প্রতিটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই এর ভাল-মন্দ দেখে চিনতে পারে। কিন্তু বাতেনী আমল, তথা অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, সম্পদের মোহ, পদের লোভ, প্রদর্শনী-লৌকিকতা, কৃপণতা, লালসা ইত্যাদি বিষয় কেউই চোখে দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি এ সকল মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জাহেরী আমলের পাবন্দ। তাকে কেউ চিনতে পারে না যে, এ ব্যক্তি বাতেনী ফিস্ক ও ফুজুরীতে (অন্যায় ও অপকর্মে) লিপ্ত আছে। সে বাহ্যিকভাবে মানুষের দৃষ্টিতে সৎ, পুণ্যবান ও খোদাভীরু সেজে থাকতে পারে।

অন্যের দৃষ্টি থেকে বাতেনী পাপসমূহ লুকায়িত থাকার ব্যাপারটি স্পষ্ট। এর চেয়ে বড় চিন্তার ব্যাপার হলো, কোন কোন সময় স্বয়ং

আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পর্যন্ত বুঝতে পারে না। এর কারণ হলো, এ সকল রোগের আকৃতি ও প্রতিক্রিয়া এমন কাজের সাথে প্রায় মিলে যায়, যা নেক অথবা বৈধ। যেমন, অহংকার এবং আত্মসম্মান প্রায় কাছাকাছি দু'টি জিনিস। কিন্তু অহংকার হারাম। আর আত্মসম্মান রক্ষা করা শরী'অতে উদ্দেশ্য। তদ্রূপ حسد (হিংসা) এবং غبطه (ঈর্ষা) প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু حسد (হিংসা) হারাম। আর غبطه (ঈর্ষা) জায়েজ বরং শরী'অতে উদ্দেশ্য। কেননা غبطة বা ঈর্ষা বলা হয়, কারো সৌভাগ্য বা সম্মান দেখে এই কামনা করা যে, এই সৌভাগ্য ও সম্মান আমারও যেন লাভ হয়। এটা কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। দোষণীয় বিষয় হলো, হিংসা। কারণ হিংসা বলা হয় যে, কারো সৌভাগ্য বা সম্মান দেখে এই কামনা করা যে, এটা তার থেকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং আমাকে যেন দেওয়া হয়। এমনিভাবে আত্মার সকল রোগ ও গোনাহের সাথে কোন না কোন গুণ ও ছওয়াবের কাজ প্রায় মিলে যায়। এ কারণেই স্বয়ং আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পর্যন্তও ধোঁকায় পড়ে যায়। অহংকারকে আত্মসম্মান আর হিংসাকে গিবতা (ঈর্ষা) মনে করে নিশ্চিত থাকে।

আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা

এজন্য আত্মার রোগের চিকিৎসা সাধারণতঃ এমন কোন কামেল পীর ও মুর্শিদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে করতে হয়, যিনি আত্মার রোগ ও গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং তিনি নিজেও আত্মার রোগ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন এবং অন্যদেরকে বেঁচে থাকার জন্য হিদায়েত করেন। অতঃপর শাইখ (পীর) যখন রোগ নির্ণয় করে তা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাপত্র দিবেন। তখন সেই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করে ঐভাবে আমল করতে হবে, যেরূপ শারীরিক রোগের কোন রোগী তার চিকিৎসার ব্যাপারে নিজকে নিজে কোন ডাক্তার বা হাকীমের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে তার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্রকে মেনে নিয়ে আমল

করতে থাকে। এমনকি রোগী নিজেও যদি ডাক্তার কিংবা হাকীম হয়, তাহলেও রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজ সিদ্ধান্ত ও রায় ত্যাগ করে চিকিৎসকের আদেশ পূর্ণরূপে মেনে চলে। জাহেরী আমলে শুদ্ধতা ও অনিষ্টতা তো কোন উস্তাযের নিকট পড়া-শোনা করে কিংবা কিতাব পড়ে কিছু না কিছু জানা যায়। কিন্তু বাতেনী আমলের সংশোধনের জন্য শুধুমাত্র কিতাব পড়ে নেওয়া (চাই তা পড়ে পূর্ণভাবে বুঝতে পারলেও) যথেষ্ট নয়। কারণ বাতেনী আমল তথা আত্মার পরিশুদ্ধি কোন কামেল পীরের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। অলৌকিক ঘটনারূপে যদি আল্লাহপাক কাউকে কোন দৌলত বাহ্যিক উপকরণ ব্যতীত দিয়ে দেন, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক নিয়ম বলা যাবে না।

বাতেনী আমল সংশোধনের জন্য ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর প্রস্তাব

আল্লাহপাক ইমাম গাযালী (রহঃ)কে বাতেনী বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যাপারে আল্লাহপাক তাকে বিশেষ পদ্ধতি দান করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ও মত হলো, স্বীয় বাতেনী গোনাহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পদ্ধতি চারটি।

প্রথম পদ্ধতি ঃ কামেল পীরের অনুসরণ

আত্মার রোগ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংশোধন করার সবচেয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হলো, এমন কোন কামেল পীর খুঁজে নেওয়া, যিনি শরী'অত ও তরীকতের সমন্বয়কারী, অন্তরের গুপ্তগুণাবলী ও দোষসমূহ নির্ণয় করা ও তার চিকিৎসার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

শয়তানের একটি ধোঁকা ও তার উত্তর

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ লোকদের বলতে শোনা যায় যে, এই যুগে সত্যিকার কামেল পীর পাবো কোথায়? সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে শুধু কেবল ধোঁকা ও প্রতারণা, কেবল প্রচার ও প্রদর্শনী। এ অবস্থায় আসল-নকল চেনাও মুশকিল। এক্ষেত্রে শয়তান সৎলোক, উলামায়ে কেরাম ও

পীর-দরবেশদের অসৎ কর্মের বিরাট ফিরিস্তি ও কাহিনী লোকদের সামনে তুলে ধরে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে ইচ্ছুকদেরকে নিরাশ করে দিতে চায়। এ ধরনের লোকেরা তাদের (আচরণে) অধিকাংশ সময় মরহুম কবি ইকবালের নিম্নোক্ত কবিতা পড়ে থাকে।

خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی سالوسی ہے سلطانی بھی عیاری

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তোমার এ সাদাসিধে বান্দা কোথায় যাবে?
দরবেশীর মধ্যেও প্রতারণা, বাদশাহীতেও ধোঁকা ভরা।

এই ফিতনা-ফাসাদ, অন্যায় ও পাপে জর্জরিত যুগে মরহুম কবি ইকবালের এ অভিযোগ অহেতুকও নয় ভুলও নয়। কিন্তু এর অর্থ যদি কেউ একথা বুঝে যে, এখন আর আত্মার সংশোধনের কোন উপায় নেই, কাজেই যা মনে আসে তাই করো, তাহলে এটা একান্তই মারাত্মক ধরনের ভুল হবে।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, এ যুগের ফিতনা-ফাসাদ, অলসতা ও অবহেলা কি কেবল মাত্র উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদার লোকদের মধ্যে, নাকি সর্বস্তরের লোকদেরই এই অবস্থা? এটাতো সকলেরই জানা কথা যে, এই যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা কোন পর্যায়ে পৌছেছে এবং কত ধরনের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এমন পূর্ণ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ডাক্তারতো হাজারেও একজন পাওয়া যায় না, যে রোগ সম্পর্কে ভালমতো বুঝে চিকিৎসা করবে এবং এতে লোকেরা আরোগ্য লাভ করবে। হাজার উকিলের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাবান একজন খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ীর মধ্যে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হাতে গোনা কয়েকজন হবে। লক্ষ লক্ষ কারিগরের মধ্যে পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত বিশেষ বিশেষ কয়েকজনই হয়। কিন্তু এ অবস্থার কারণে কেউ কোন দিন অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া ত্যাগ করে চিকিৎসার ব্যাপারে নিজ রায়ের উপর চলে না। উকিলদেরকে ছেড়ে নিজেই নিজের মামলা-মোকাদ্দমা পরিচালনা

করে না। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসা ত্যাগ করেনি। কারিগরগণও তাদের কর্ম ত্যাগ করেনি। এ সকল লোকদের মধ্য থেকেই ভাল লোক নির্বাচন করে নিয়ে কাজ চালানো হয়।

আজকাল বাজারে না খাঁটি ঘি পাওয়া যায়, না দুধ, না আটা, না মসল্লা। কিন্তু খাঁটি জিনিস না পাওয়া যাওয়ার কারণে কেউ ঘি, দুধ, আটা বা মসল্লা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছে বলে শোনা যায়নি। কিংবা আটা বা ঘির পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করছে বলেও শোনা যায়নি।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করে এই ধোঁকা, প্রতারণা ও ভেজাল ভরা বাজার থেকেই পরিশ্রমী লোকেরা খাঁটি ও উন্নত জিনিস বের করে নেয়।

দ্বীনের ব্যাপারে আজ কেন এই পন্থা অবলম্বন করা হয় না? অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের ওয়াদাও আছে যে, সত্যিকার কামিল লোক কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকবে এবং অনুসন্ধানকারীগণ সব জায়গায় তাদেরকে পাবেন। আল্লাহপাক ইরশাদ করেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা আত্-তাওবাহ ১১৯)

সত্যবাদী বলতে ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা যবান, হাত, কথা, কাজ সবকিছুতে সত্যের পরিচয় দেয়। এটা কামেল ওলীর গুণাবলীর সারাংশ।

ইমাম রাযী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ 'তাফসীরে কাবীরে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সত্যবাদীদের সোহবতে (সংসর্গে) থাকার এবং তাদের সাথী হওয়ার এই হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আগমনকারী সকল মুসলমানের জন্য। কাজেই এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই ওয়াদা রয়েছে যে, মুসলমান জাতি কখনো সাদেকীন (সত্যবাদী) শূন্য হবে না। অতঃপর ইমাম রাযী (রহঃ) এই

আয়াত থেকেই 'ইজমায়ে উম্মাত' (উম্মাতের ঐক্যমতের ফায়সালা) শরী'অতের একটি দলীল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন। কেননা মুসলমান সম্প্রদায় যখন সত্যবাদী-শূন্য হবে না, তখন এটা কোনভাবেই সম্ভব নয় যে, কোন যুগের সকল মুসলমান কোন ভুল সিদ্ধান্তে কিংবা গোমরাহীর কাজে একমত হবে। কারণ সাদেকীন তথা সত্যবাদীগণ গোমরাহীর শিকার হবেন না।

একথা অবশ্য ঠিক যে, এই যুগে সবকিছুতে বিশেষ করে নেক ও উত্তম কাজে বিপর্যয় ও অধঃপতন সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগে ধোঁকা-প্রতারণা প্রদর্শনী ও প্রচারণাই বেশী। খাঁটি এবং আসল জিনিস খুবই কম। সোনালী যুগে সত্য-সুন্দর ও ভালর আধিক্য ছিলো। সকল জায়গায় সকল অঞ্চলে সত্য-সুন্দর ও উত্তমের প্রাচুর্য ছিলো। আজ এ জিনিস অনেক কষ্টে অনেক অনুসন্ধানের পর পাওয়া যায়, কিন্তু তাও সে যুগের মত ততটা উন্নত নয়। কিন্তু যেহেতু এ যুগে ভাল ও খাঁটি লোক খুব কম পাওয়া যায় এবং অনেক অনুসন্ধান ও কষ্টের পরে পাওয়া যায়, সেহেতু আল্লাহ্‌পাকও এ যুগের লোকদের বিনিময় এত বেশী পরিমাণে দিয়ে থাকেন যে, এ যুগের সাথে পূর্ব যুগের কোন তুলনাই হয় না।

হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

للعامل فيهن مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل يارسول الله اجر خمسين رجلا منا ام منهم قال لا بل اجر خمسين رجلا منكم

অর্থাৎঃ 'আখেরী যমানায় একজন নেককারকে পঞ্চাশজন আমলকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেই যুগের পঞ্চাশজন? না কি আমাদের যুগের পঞ্চাশ জন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ না! তোমাদের (যুগের) পঞ্চাশজনের সমান ছওয়াব পাবে।'

(তিরমিযী ২ঃ১৩৬, আবু দাউদ ৫৯৬, ইবনে মাজাহ ২৯০)

এখন আপনারাই চিন্তা করুন, এই ফিতনার যুগে যে ব্যক্তি সৎপথে থেকে নেক কাজে লিপ্ত থাকবে, তার ছওয়াব পঞ্চাশজন হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও অন্যান্য ছাহাবীর মতো হবে। এ যুগের লোকদের আমলে ছওয়াব এত বেশী এজন্য দেওয়া হবে যে, এই যুগে নেক লোকদের সোহবতও অনেক কষ্টে লাভ হয়। আর নেকীর উপর টিকে থাকা, জলন্ত অগ্নি হাতে রাখার মতো মুশকিল।

শয়তানের আরেকটি ধোঁকা

কামেল পীর খুঁজে বের করা এবং উপযুক্ত শাইখ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শয়তান মানুষকে আরেকটি ধোঁকায় লিপ্ত করে রাখে। আর তাহলো, পূর্বকালের খাঁটি বুযুর্গ ও অলীআল্লাহ্দের যে ধরনের উচ্চ গুণাবলীর কথা সংকলিত কিতাব-পত্রে লিখা আছে, এ যুগের লোকেরা তা পাঠ করে ঐ পর্যায়ের লোকদেরকে এ যুগেও খুঁজতে শুরু করে। পরে যখন ঐ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহওয়ালা খুঁজে পায় না, তখন নিরাশ হয়ে আত্মশুদ্ধির চিন্তা পরিত্যাগ করে বসে।

এর মধ্যে এই ধোঁকা আছে যে, কালের বিপর্যয় একটি অনস্বীকার্য বাস্তব। কুরআন-হাদীছে এ কথার সমর্থনে দলীল আছে। আজকের দুনিয়াতে কোন আবু বকরও পয়দা হবে না। জন্ম নিবে না কোন উমর বা অন্য সাহাবী। না ফিরে আসবেন হযরত জুনাইদ ও শিবলী। পাওয়া যাবে না কোন মারুফ কারখী কিংবা যিননূন মিসরী। যে ব্যক্তি উপরোক্ত মহান বুযুর্গদেরকে নিজ পীর নির্বাচনের মাপকাঠি বানিয়ে অনুসন্ধান চালাবে, তার জন্য ব্যর্থতা ছাড়া অন্য কিছু নসীবে নেই। একজন কামেল পীর হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে শর্তাবলী রয়েছে সেগুলোকে মাপকাঠি বানিয়ে পীর তালাশ করতে হবে। তাহলে, ইনশাআল্লাহ সর্বযুগে ও সর্বস্থানে সত্যিকারের কামেল লোক পাওয়া যাবে।

আউলিয়ায়ে কেরামের পরিচয়

কামেল অলীআল্লাহ্ হওয়ার জন্য কয়েকটি জিনিস শর্ত।

প্রথম শর্তঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্ভব না হলেও প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা, যেন দ্বীনী আহকামের উপর আমল করতে পারে।

দ্বিতীয় শর্তঃ সব সময় শরী'অতের আহকাম তথাঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায়ে কোনরূপ অবহেলা না করা। হারাম ও মাকরূহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন সময় কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তাওবা করা।

তৃতীয় শর্তঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহপাকের যিকির করা। অর্থাৎ, (দিনের ও রাতের) অধিকাংশ সময় যিকিরে লিপ্ত থাকা। চাই সে যিকির দু'আ-দুরূদ ও তাছবীহ্ পাঠের মাধ্যমে হোক বা একমাত্র আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে দ্বীনী শিক্ষাদান, কিতাব রচনা ও সংকলন, ফতোয়া প্রদান বা মানুষকে ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে হোক। কেননা এ সকল জিনিসও ইখলাসের সাথে করলে যিকিরের মধ্যে গণ্য হয়।

চতুর্থ শর্তঃ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কামেল পীর কর্তৃক অন্যান্য মানুষের আত্মশুদ্ধি ও পথ প্রদর্শনের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে।

পঞ্চম শর্তঃ তার সংসর্গে (সোহবতে) কিছুদিন বসলে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ এবং দুনিয়ার অহেতুক ঝামেলার প্রতি ভীতিভাবের উন্মেষ ঘটে থাকে।

উপরোক্ত এই ক'টি বৈশিষ্ট্য ও শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে-ই আত্মার সংশোধনকারী ও পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে যথেষ্ট হবে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি যদি একাধিক হয়, তাহলে তাদের মধ্য হতে যার প্রতি ভক্তি ও মুহাব্বত বেশী হবে এবং যার সাথে মন-মানসিকতা ও মেজাযের মিল বেশী হবে, তাকেই স্বীয় মুর্শিদ (পীর) নির্বাচন করবে।

আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় পদ্ধতি

যদি কেউ উপরোক্ত শর্ত ও গুণাবলী বিশিষ্ট কোন কামেল পীর (মুর্শিদ) খুঁজে না পায়, তাহলে তার জন্য ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, সে যেন নিজের মুখলিস বন্ধুদেরকে আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের জন্য নিজের উপর নিয়োজিত করে নেয়। সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের দৃষ্টিতে আমার মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে? তারা যা যা বলবেন. সেগুলো সংশোধনের চিন্তা করবে।

হযরত ফারূকে আযম উমর (রাযিঃ) হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে নিজ ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)-কে বললেনঃ আপনি আমার (দ্বীনী) ভাই! আপনি আমার মধ্যে কি কি দোষ লক্ষ্য করে থাকেন, আমাকে বলুন! প্রথমেতো হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) আদবের কারণে বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু হযরত উমরের (রাযিঃ) পীড়াপীড়িতে বলতে বাধ্য হলেন যে, আমি আপনার মধ্যে দু'টি দোষ দেখি।

প্রথম দোষ এই যে, আপনার দস্তরখানে একাধিক প্রকারের খানা দেখা যায়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসের পরিপন্থী। দ্বিতীয় দোষ এই যে, আপনার নিকট একাধিক জোড়া কাপড় দেখা যায়, যার এক জোড়া আপনি দিনে ব্যবহার করেন এবং অপর জোড়া রাতে ব্যবহার করেন।

হযরত ফারূকে আযম (রাযিঃ) একথা শুনে বললেন, এ দুই রোগের চিকিৎসা ইনশাআল্লাহ এখনই করা হবে। আপনি এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। (ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ৭ঃ৩৪৮)

হযরত ফারূকে আযম (রাযিঃ) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী সকল বুযুর্গের সর্বদা এই অভ্যাস ছিলো যে, তারা তাদের নফসের (প্রবৃত্তির) দোষ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতেন এবং তার চিকিৎসার ব্যাপারেও কখনো অলসতা করতেন না।

একবার হযরত উমর (রাযিঃ)-এর নিকট বিদেশী দূত আসলো। এ উপলক্ষ্যে হযরত উমরের দরবারকে সুসজ্জিত করা হয়েছিলো। দরবারের কাজ শেষ হতেই হযরত উমর (রাযিঃ) একটি 'মশক' নিয়ে কূপের নিকটে গিয়ে নিজ হাতে পানি ভরে (কাঁধে করে) নিজেই এক প্রতিবেশী বৃদ্ধার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। লোকেরা যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো। তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ বিদেশী দূতের জন্য নিজ দরবারকে শান-শওকতের দৃষ্টিতে দেখতে হয়েছিলো। এতে আমার আশংকা হলো যে, আমার অন্তরে আবার অহংকার সৃষ্টি না হয়ে যায়।

কাজেই আমি এর সংশোধনের জন্য এমন কাজ করলাম যাতে নিজ নফসের (প্রবৃত্তির) অবমাননা ও নীচুতা প্রকাশ পায়।

সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরামের এটাও বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এবং বন্ধুত্ব সুলভ আচরণের মাধ্যমে একে অন্যের দোষের ব্যাপারে এমনভাবে সতর্ক করতেন যে, এতে অন্যকে অপমান-অপদস্থ করার বা ক্ষতি করার কোন সন্দেহও হতো না।

আজ-কাল এমন বন্ধু পাওয়াও কঠিন। আজ-কালতো দোষ দেখে তার সামনে কিছুই বলবে না। কিন্তু অন্য লোকের নিকট বলে বেড়াবে এবং প্রচার করবে। এ সকল লোক আসলে বন্ধু নয়। বন্ধুত্বের বেলায়ও সৎ ও নেককার লোককে নির্বাচন করা উচিত।

আত্মশুদ্ধির তৃতীয় পদ্ধতি

আত্মশুদ্ধির তৃতীয় পদ্ধতি হলো, নিজ শত্রু দ্বারা নিজের সংশোধন করানো। এটা এইভাবে করাবে যে, শত্রুপক্ষ দোষ তালাশ করতে গিয়ে যে সকল দোষের কথা বলে, সেগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। অতঃপর নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, শত্রুপক্ষের কোন্ কোন্ কথা সত্য এবং তাদের বলা কোন্ কোন্ দোষ আমার ভেতর আছে? যেগুলো বিদ্যমান আছে, সেগুলো দূর করার চিন্তা ও চেষ্টা করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাধারণ নিয়ম এটাই ছিলো। আমাদের এ যুগের বুযুর্গ ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহীর (রহঃ) একটি ঘটনা স্মরণ হলো।

হযরত রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) যখন গাংগুহ্র কুদ্দুছিয়া খানকায় অবস্থান করে সেখানে দরসে হাদীছ, লোকদের আত্মশুদ্ধি ও পথ প্রদর্শনের কাজ শুরু করলেন, তখন তিনি লোকদেরকে শিরক, বিদ'আত ও কু-প্রথা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে কতিপয় পুস্তিকাও রচনা করে প্রচার করলেন। সে সময় আহমাদ রেজা খান বেরলভী বিভিন্ন প্রকার বিদ'আতের প্রচলন ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। সে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অসত্য

অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন এবং মিথ্যা দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে লাগলো। হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক ধরনের অশ্লীল ভাষায় প্রচার পত্র ও পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রচার করতে শুরু করলো। এই বই ও প্রচার পত্র যখন হযরত গাংগুহীর নিকট পৌছতো, তখন তিনি এগুলো অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনতেন। কারণ শেষ বয়সে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। চিঠি-পত্র বিষয়ক সকল কাজ হযরত গাংগুহীর (রহঃ) খাছ মুরীদ হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব কান্দুলবী (রহঃ)-এর দায়িত্বে ছিলো। এ সকল পুস্তিকায় যেহেতু মারাত্মক ধরনের অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হতো এবং মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগে পূর্ণ থাকতো, তাই এগুলো হযরতকে শোনানো মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের জন্য খুবই কষ্টকর হতো। এজন্য কিছুদিন তিনি এগুলো হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর খিদমতে পেশ করা থেকে বিরত থাকেন। কয়েক দিন পর হযরত গাংগুহী (রহঃ) জিজ্ঞাসা করেনঃ মৌলবী ইয়াহ্ইয়া! আমাদের দোস্তরা (?) আমাদেরকে কি ভুলে গেলেন? কারণ অনেক দিন যাবত (ডাকে) আমাদের বিরুদ্ধে লিখা কোন পুস্তিকা আসছে না, সে সময় মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (রহঃ) বললেনঃ হযরত পুস্তিকাতো কয়েকটিই এসেছে। কিন্তু আমি দেখলাম তাতে গালি-গালাজ, মিথ্যা অপবাদ ও বানোয়াট কথাবার্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। এজন্য আমার মনে হলো, অযথা এ সকল কথা আপনাকে শুনিয়ে আপনার মন খারাপ করবো কেন।

এটাতো মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের নিজস্ব ধারণা ছিলো। কিন্তু অপরদিকে হযরত গাংগুহী (রহঃ) ছিলেন আল্লাহ্র এমন এক পবিত্র বান্দা, যিনি নিজের সকল লোভ-লালসা, পদ ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। কাজেই তিনি বললেনঃ না, এমন করবে না। যত পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র আসবে, সব আমাকে অবশ্যই শোনাবে। কারণ আমি এ সকল জিনিস এই নিয়তে শুনি যে, আমার যত দোষের কথা তারা লিখে থাকে, হতে পারে তার মধ্যে কিছু সত্য কথাও আছে। আমি সেগুলো সংশোধন করে নিবো।

আত্মশুদ্ধির চতুর্থ পদ্ধতি

আত্মার দোষ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংশোধন করার চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আপনার দৃষ্টিতে অন্য লোকের যে সকল বিষয় দোষনীয় বা আপত্তিকর মনে হয়, সেগুলো নিজের মধ্যে আছে কি-না খুঁজে দেখা। যদি কোন দোষ পাওয়া যায়, সাথে সাথে তার সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এভাবেও মানুষ স্বীয় দোষ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংশোধন করতে পারে। আসল কথা হলো, উপরোক্ত সব কটি পদ্ধতিতেই নিজ নিজ সংশোধনের কাজ অব্যাহত রাখবে। বিশেষ করে প্রথম পদ্ধতির (অর্থাৎ কামেল শাইখের সংসর্গে থেকে ইসলাহ করার) জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। والله المستعان وعليه التكلان

প্রবৃত্তির চাহিদা ও তার প্রকারভেদ

বিগত মজলিসে দুই প্রকার বাতেনী আমল, তথা ফাযায়েল (সৎ গুণাবলী, ও রাযায়েল (দোষসমূহ) ও তার সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো ফাযায়েলসমূহ হাসিল করা ও রাযায়েলসমূহ বর্জন করা। যেমন, নামায আদায়ের পূর্বে উযূ করে নিতে হয়, কারণ উযূ ব্যতীত নামাযের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রুপ বাতেনী ফযীলত হাসিল করার পূর্বে জরুরী হলো স্বীয় অন্তরকে রাযায়েল তথা আধ্যাত্মিক রোগ মুক্ত করা। এজন্য আজকের মজলিসে রাযায়েল তথা আধ্যাত্মিক রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আত্মার রোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মৌলিক রোগ হলো, প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির অনুসরণ। অর্থাৎ স্বীয় নফসকে (প্রবৃত্তিকে) তার চাহিদা ও খাহেশ পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া। পরবর্তীতে অন্যান্য যত আত্মিক রোগের আলোচনা করা হবে, তার সবই প্রকৃত প্রস্তাবে এই এক রোগ থেকে উৎপন্ন। কোন লোক যদি স্বীয় নফস (প্রবৃত্তি)-কে কন্ট্রোলে (নিয়ন্ত্রণে) রেখে শরী'অতের বিধি-নিষেধের পাবন্দ বানাতে পারে, তাহলেই তার নফস সকল রোগ থেকে মুক্ত হতে

পারবে। সাথে সাথে অত্যন্ত সহজভাবে ফাযায়েল তথা আত্মিক গুণাবলী অর্জন করতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নফসানী খাহেশাতকে (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশিকে) নিজের ইমাম (অনুসরণীয়) বানিয়েছে, নফসের খাহেশাত (চাহিদাসমূহ) তাকে আত্মিক গুণাবলী হতে বহু দূরে নিক্ষেপ করবে এবং শত শত আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত করে দিবে।

এজন্য পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে প্রবৃত্তির অনুসরণের ধ্বংসাত্মক ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল শিক্ষা-দীক্ষার মূল কথা এটাই যে, মানুষ কেবলমাত্র ঐ হিদায়েতনামার অনুসরণ করবে, যা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়ে এসেছে এবং যার প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। কারণ প্রবৃত্তি ও নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ তার জন্য বিষতুল্য।

আল্লামা শাতেবী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "موافقات" এ বিস্তারিতভাবে একথার উপর আলোকপাত করেছেন যে, অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবের উদ্দেশ্য এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্মিলিত ও মৌলিক পয়গাম মাত্র দুটি শব্দ। هوى (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশী) এবং هدى (হিদায়েত)। هدى তথা হিদায়েত অনুসরণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং هوى তথা প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই পূর্ণ ইসলাম। এর মধ্যেই পূর্ণ শরী'অত ও তরীকত লুকায়িত আছে। কিন্তু যেহেতু এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক, তাই এটা হাসিল করাও খুবই কঠিন। এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা, পরিশ্রম ও মেহনত-মুজাহাদা (সাধনা) করার প্রয়োজন হয়। এজন্যই দেখা যায় যে, দুনিয়াতে হিদায়েতের মাপকাঠিতে যাদের উত্তীর্ণ হওয়া নসীব হয়েছে, তাদের সকলকেই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমেই উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا جز آہ سحرگاہی

অর্থাৎ, হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহঃ) হোক, কিংবা হযরত জালালুদ্দীন রুমী (রহঃ) অথবা ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) বা ইমাম গাযালী (রহঃ) হোক; তাঁদের কারো কোন কিছু লাভ হতো না, যদি গভীর রাতে উঠে আল্লাহ্‌র দরবারে কিছু কান্নাকাটি না করতেন।

কেবলমাত্র নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) এই নিয়মের বহির্ভূত। কারণ তাদের সকল ফযীলত ও যোগ্যতা আল্লাহ প্রদত্ত্ব। এতে সাধনা ও পরিশ্রমের কোন দখল নেই। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌পাকের চিরন্তন নিয়ম এটাই যে, তাদেরকে কঠোর সাধনা-পরিশ্রমের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। হযরত মুছা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেছেনঃ

شبان وادی ایمن گھے رسد بمراد

که چند سال بجان خدمت شعیب کند

অর্থাৎ, হযরত মূছা (আঃ) তখনই নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন, যখন দীর্ঘদিন হযরত শু'আইব (আঃ)-এর খিদমতে কাটিয়েছেন।

খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওত প্রদানের পূর্বে আল্লাহ্‌পাক নির্জনতা অবলম্বন ও দিনের পর দিন হেরা গুহায় থেকে একান্তে তাঁর ইবাদাত করার জন্য মানসিকভাবে উৎসাহিত করেছেন। (সহীহ বুখারী শরীফ ১ঃ২)

আল্লাহ্‌পাকের অলীদের মধ্যে কদাচিত দু' একজনকে বিনা পরিশ্রম ও কোন প্রকার সাধনা ব্যতীত এই হিদায়েতের মহান দৌলত দান করা হয়েছে।

প্রবৃত্তির চাহিদা দুই প্রকার

সুফিয়ায়ে কেরাম রিপু দমন এবং প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধাচরণ করার কথা গুরুত্বের সাথে বার বার বলে থাকেন। যে সকল লোক তাছাওউফের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত নয়, তারা এর ব্যাপক অর্থ করে

এটাকে বৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করে হযরত সুফিয়ায়ে কেরামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু আসল কথা হলো, প্রবৃত্তির চাহিদা দুই প্রকার। (এক) **حقوق نفس** (হুকূকে নফস) (দুই) **حظوظ نفس** (হুযূযে নফস)। হুকূকে নফস ঐ সকল বিষয়কে বলে, যার উপর জীবনের ভিত্তি। যেমন, পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, প্রয়োজনানুপাতে (হালাল উপায়ে) যৌন চাহিদা মিটানো। এ সবই হুকূকে নফস। এ সকল চাহিদা পূর্ণ করা কেবল জায়েযই নয়, বরং এগুলো শরী'অতের উদ্দেশ্য এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ফরয ও ওয়াজিব। হাদীছ শরীফে এ সকল চাহিদা পূর্ণ করার নির্দেশ এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

. . . ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا –

অর্থাৎ, তোমার নিজ নফসের তোমার উপর অধিকার (হক) আছে, তোমার চোখেরও তোমার উপর অধিকার (হক) আছে, (যে কিছু সময় ঘুমিয়ে তাকে আরাম দিবে) তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর অধিকার (হক) আছে। (সহীহ বুখারী ১ঃ২৬৫ সহীহ মুসলিম ১ঃ৩৬৫)

এ সকল অধিকার (হক) ত্যাগ করাকে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বলে। এটা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তবে দ্বিতীয় প্রকার, যেটাকে **حظوظ نفس** (হুযূযে নফ্স) বলে। তাহলো, নফসের ঐ সকল অভিলাষ ও সম্ভোগ স্পৃহা যা জীবনধারণ ও বংশ রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত। সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় রিপু দমন ও প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধাচরণ বলতে এই দ্বিতীয় প্রকার থেকে বেঁচে থাকাকেই বুঝানো হয়েছে। যাতে মানুষ অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। কারণ এ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মানুষ গোনাহের শিকার হয়ে যায়। এ বক্তব্য কেবলমাত্র সুফিয়ায়ে কেরামের নয়। কুরআন ও হাদীছ শরীফের অসংখ্য জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি আয়াতই যথেষ্ট।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেনঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে (হিসাবের জন্য) দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে (নফসকে) খেয়াল-খুশি মতো চলা থেকে বিরত রেখেছে। নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার ঠিকানা। (সূরা আন নাযি'আত ৪০-৪১)

কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় هوى (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি) শব্দটি هدى (হিদায়েত) শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। هوى শব্দ (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি) বলে ঐ সকল কামনা-বাসনাকে বুঝানো হয়েছে যা حظوظ نفس (নফসের বিলাস-ব্যসন)-এর অন্তর্ভুক্ত। এই (অহেতুক) জিনিস থেকে বেঁচে থাকার জন্যই সাধনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

মুজাহাদার (সাধনার) হাকীকত

প্রকৃত মুজাহাদা বা সাধনার অর্থ হলো, নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কতিপয় জায়েয কাজকেও ত্যাগ করার অভ্যাস করা। এ ধরনের মুজাহাদা আসল উদ্দেশ্য নয়। পরবর্তীতে যখন স্বীয় প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে যাবে, তখন এই মুজাহাদা পরিত্যাগ করা হয়। সুফিয়ায়ে কেরামের রাত্রি জাগরণ, অভুক্ত থাকা, কারো সাথে কথাবার্তা না বলা এবং লোকদের সংশ্রব ত্যাগ করা ইত্যাদি এ ধরনের মুজাহাদার অন্তর্ভুক্ত।

একটি দৃষ্টান্ত

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব। যিনি কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর মুরীদ এবং জামেউল কামালাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব (রহঃ)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজ কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দের

ছাত্রদের সাথে সাধারণ কথা-বার্তা বলছিলেন। তখন আমি বললাম, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সম্পর্কে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বনের কথা বলা হয়ে থাকে, এর হাকীকত কি? হযরত মাওলানা আমার হাত থেকে একটি কিতাব নিয়ে তার একটি পাতার কোনা মুড়ে ফেরত দিয়ে বললেন, এই মোড়ানো পাতাটি (আগের মত) ঠিক করো। আমি বার বার ঠিক করা সত্ত্বেও তা পুনরায় মুড়ে যাচ্ছিলো। হযরত মাওলানা পুনরায় কিতাবটি আমার হাত থেকে নিয়ে ঐ পাতা মোড়ানো কোনটিকে বিপরীত দিকে মুড়ে দিয়ে কিতাবটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেনঃ এখন ঠিক করো, এবার যখন ঠিক করলাম, ঠিক হয়ে গেলো।

এ দৃষ্টান্ত পেশ করার পর তিনি বললেনঃ ব্যস, কথাবার্তা ত্যাগ, খানা-পিনা ত্যাগ, নিদ্রা ত্যাগ ইত্যাদি মুজাহাদার দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, দৃঢ়পদতা এবং ঠিক হয়ে যাওয়া। কিন্তু সাধারণতঃ নফস (প্রবৃত্তি) ঐ সময় পর্যন্ত ঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে বিপরীত দিকে মোড়ানো হয়। নফস হালাল খাদ্য গ্রহণে, বৈধ (পরিমাণ) শয়নে এবং হালাল কথা বলার ক্ষেত্রে তখনই প্রস্তুত হবে, যখন কিছুদিনের জন্য খাদ্য গ্রহণ একেবারে ছেড়ে দেওয়া হবে। নিদ্রাও একেবারে ত্যাগ করা হবে এবং কথাবার্তা ত্যাগের ব্যাপারে এমন অভ্যস্ত করবে যে, নফসের হক আদায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ, নিদ্রা যাওয়া এবং কথা বলা একেবারে পরিত্যাগ করবে। পরবর্তীতে যখন নফস এ সকল ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন এগুলো পরিত্যাগ করা ঠিক হবে না। বরং সুন্নাত মোতাবেক হালাল বস্তুসমূহকে শোকরিয়ার সাথে ব্যবহার করা এবং হারাম ও অবৈধ (বস্তু ও বিষয়সমূহ) থেকে বেঁচে থাকাই উদ্দেশ্য এবং এটাই বাঞ্ছনীয়।

উলামায়ে কেরাম ও তালাবা সম্প্রদায়

উলামায়ে কেরাম ও তালাবা সম্প্রদায় ইসলামী কিতাবাদী পাঠ করে হালাল-হারাম, মুস্তাহাব এবং মাকরূহ সম্পর্কিত ইলম হাসিল করে নেয়। যা আল্লাহপাকের অনেক বড় নি'আমত। কিন্তু মুজাহাদা (সাধনা)

ব্যতীত এ সকল জিনিসের উপর আমল করা সম্ভব হয় না। যেমন, কবি গালিব বলেছেনঃ

جانتا هون ثواب طاعت وزهد

پر طبيعت ادهر نهين آتى

অর্থাৎ, ইবাদত বন্দেগীর ছওয়াবতো আছে আমার জানা, কিন্তু ইবাদত বন্দেগীর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয় না।

প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা যেমন ফরয, সেই ইলম অনুসারে আমলে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য মুজাহাদা করাও আবশ্যক। উম্মাতের সকল আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের নিয়ম এটাই ছিলো। নিকট অতীতের উলামায়ে আকাবেরে দেওবন্দ তথা হযরত গাংগুহী (রহঃ), হযরত নানূতুবী (রহঃ), হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ), হযরত থানবী (রহঃ) সহ অন্যান্যদের ইলম ও আমলের দুনিয়া জোড়া যে খ্যাতি অর্জিত হয়েছে, এটা শুধুমাত্র কিতাব পড়া ও পড়ানোর ফল নয় বরং এটা তাদের ঐ সাধনার (মুজাহাদা) সুফল, যে সাধনা এ সকল বুযুর্গ নফসের (প্রবৃত্তির) খেয়াল-খুশি থেকে বেঁচে থাকার জন্য করেছিলেন। এ যুগের উপযোগী মুজাহাদার (সাধনা) বিস্তারিত বর্ণনা আগামী মজলিসে করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

আত্মার গুণাবলী ও তার বিকাশ
মাকামে মহব্বত

কবি বলেন,

عشق ہی زندگی کا سوز + عشق ہی زندگی کا ساز

অর্থাৎ, প্রেমই জীবন গড়ার উপাদান, প্রেমই জীবন ধ্বংসের উপকরণ।

যে সকল বাতেনী আমল বা আত্মার গুণাবলী অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক, তার মধ্য হতে একটি হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

অর্থাৎ, ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহপাকের প্রতি সবচেয়ে বেশী মহব্বত রাখেন। (সূরা বাকারা ১৬৫)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما (او كما قال)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সবকিছু থেকে বেশী প্রিয় হবে।

(মুসনাদে আহমাদ ৪ঃ৬৮)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছের আলোকে একথা জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত

পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। মহব্বতের দাবী করা খুবই সহজ কাজ এবং এ মৌখিক খেদমত সকলেই আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু কবি বলেনঃ

وكل يدعى حبا لليلى + وليلى لاتقرلهم بذاكا

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই লাইলার প্রেমের দাবী করে, কিন্তু লাইলা তাদের এ প্রেমের স্বীকৃতি দেয় না।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রেমের কোন হাকীকত অন্তরে আছে কি না? দুনিয়ার অপরাপর বস্তুর ন্যায় প্রেমেরও একটি নিদর্শন আছে। আর প্রেমের বা মহব্বতের একটি নিদর্শন হলো, প্রেমাস্পদের আনুগত্য।

কবি বলেনঃ ان المحب لمن يحب مطيع

অর্থাৎ, প্রেমিক প্রেমাস্পদের আনুগত্য করে থাকে।

এ কথাটিকেই পবিত্র কুরআনে এভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, (হে নবী!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৩১)

আল্লাহপাকের ভালবাসা লাভের উপায়

প্রথম পদ্ধতিঃ এখন প্রশ্ন হলো এই ভালবাসা কিভাবে অর্জন করা যাবে। এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বীয় অন্তরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের মহব্বত থেকে মুক্ত করতে হবে। সুফীয়ায়ে কেরাম একটি বাস্তব কথা বলেছেন যে, মানুষের ক্বলব (অন্তর) এমন একটি পাত্র, যার মধ্যে একই সময়ে দুই জিনিস অবস্থান করতে পারে না। অন্তরকে আল্লাহ্পাক একমাত্র তাঁর মুহাব্বাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি এই অন্তর দুনিয়া এবং সম্পদ ও পদের মহব্বতে পূর্ণ থাকে, তাহলে এ অন্তরে আল্লাহপাকের মহব্বত কিভাবে আসবে?

হযরত থানভীর (রহঃ) একটি কাহিনী

একদা হযরত থানভী (রহঃ) খানকাহ্ থেকে বাসায় যাচ্ছিলেন, আমার সেদিকে প্রয়োজন থাকায় আমিও সাথে চললাম। রাস্তায় চলতে চলতে হযরত থানভী (রহঃ) হঠাৎ দাড়িয়ে পকেট থেকে কাগজ ও কলম বের করে কি যেন লিখে পকেটে রেখে দিলেন। অতঃপর নিজেই আমাকে বললেনঃ মৌলবী শফী! কিছু বুঝতে পেরেছো? আমি 'না' বলার পর তিনি বললেনঃ অন্তরের বোঝা কাগজের উপর রেখে দিলাম। একটি কাজের কথা স্মরণ হলো, কাজটি খানকায় ফিরে গিয়ে করতে হবে। যদি এটা লিখে না রাখতাম, তাহলে বার বার অন্তরে (উদয় হয়ে) খটকা সৃষ্টি করতো। লিখার পর অন্তর খালি আছে। অতঃপর বললেনঃ 'অন্তরকে আল্লাহ্‌পাক নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং অন্তরকে ব্যস্ত রাখার আসল জিনিস হলো, আল্লাহ্‌পাকের স্মরণ। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে অন্তরে অন্য জিনিসের খেয়াল রাখায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্তরকে দুনিয়াবী বস্তুর মহব্বত এবং তার চিন্তায় পূর্ণ করে রাখা নিতান্তই ভুল। আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এবং আউলিয়ায়ে কেরাম ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য এটাই, তাঁরাও দুনিয়ার কাজ-কর্ম করতেন এবং আমরাও করে থাকি। কিন্তু তাঁরা دست بكار دل بيار (অর্থাৎ, হাত কাজে লিপ্ত কিন্তু অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ধ্যান) এর বাস্তব নমুনা ছিলেন। নিছক দুনিয়ার কাজ করার সময়ও তাদের অন্তর আল্লাহ্‌পাকের যিকির ও তাঁর স্মরণে ব্যস্ত থাকতো। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের অবস্থা এই যে, এ সকল কাজে আমাদের হাত-পা কম ব্যবহৃত হলেও, আমাদের অন্তর সর্বদা দুনিয়ার মধ্যে লিপ্ত থাকে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন কেমন ছিলো? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) উত্তরে বললেনঃ

كان يكون فى مهنة اهله فاذا سمع الاذان خرج

অর্থাৎ,মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অন্যান্য পুরুষের মতোই) নিজ পরিবারের খেদমত করতেন। [কিন্তু (অন্যদের থেকে তাঁর)

পার্থক্য হলো তিনি সকল দুনিয়াবী কাজ সম্পাদন করার সাথে সাথে] যখন তাঁর কানে আযানের আওয়াজ আসতো তিনি (নামাযের জন্য) চলে যেতেন। (বুখারী শরীফ হাদীছ নম্বর ৫৩৬৩)

ইমাম আবু দাউদের উস্তাযের কাহিনী

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)-এর উস্তাযদের মধ্যে একজন বুযুর্গ হাদ্দাদ (কর্মকার) ছিলেন। তাঁর নিয়ম এই ছিলো যে, উত্তপ্ত লৌহ খন্ডে প্রহার করতে করতে যেই আযানের আওয়াজ শুনতেন সে সময়ে যদি লোহা পেটানোর জন্য হাতুড়ী মাথার উপরে তোলা অবস্থায় থাকতো, তাহলে তা পিছনের দিকে ফেলে দিতেন। আযানের আওয়াজ শোনার পর লৌহ দন্ডে একটি আঘাত করাও সমীচীন মনে করতেন না।

হযরত তালহার (রাযিঃ) কাহিনী

হযরত তালহা (রাযিঃ) বিপুল অর্থ খরচ করে একটি বাগান আবাদ করেছিলেন। একদিন রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বাগানে গিয়ে একটু অবসর পেয়েই নামাযে দাড়িয়ে গেলেন। ইত্যবসরে একটি পাখি এসে খেজুর বাগানের ঘন পাতায় আটকে গেলো এবং ছটফট করতে লাগলো। হযরত তালহা (রাযিঃ) যখন এ অবস্থা অবলোকন করলেন, তখন সামান্য সময়ের জন্য নামায থেকে তাঁর মনোযোগ পাখির প্রতি আকৃষ্ট হলো। সালাম ফিরানোর পর সতর্ক হলেন। সাথে সাথে হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেনঃ এই বাগান আমাকে নামায থেকে গাফেল করেছে, কাজেই আমি এ বাগান আল্লাহর রাস্তায় সদকা (দান) করে দিলাম। সে যুগেই এ বাগান নয় হাজারে বিক্রি হলো।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৩২ পৃষ্ঠা)

মোটকথা আল্লাহ পাকের মহব্বত লাভের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো অন্তরকে আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য জিনিসের মহব্বত থেকে মুক্ত করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ এছাড়া আল্লাহপাকের মহব্বত অন্তরে পয়দা করার দ্বিতীয় পন্থা হলো, মা'রেফাত লাভের চেষ্টা করা। অর্থাৎ, মানুষ

যদি বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, কোন লোকের সাথে অন্য লোকের ভালবাসা চার কারণে হয়ে থাকে। (১) রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে, (২) গুণ ও যোগ্যতার কারণে, (৩) ধন-সম্পদের কারণে, (৪) দয়া-দাক্ষিণ্যের কারণে। এই চারটি জিনিসই আল্লাহপাকের মধ্যে এত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় যে, অন্য কারো মধ্যে ঐ পরিমাণের কল্পনাই করা যায় না। সৃষ্টি জগতের কারো মধ্যে যদি এর কোনটি পাওয়া যায়, তবে সেটা আল্লাহপাকেরই দান। সুতরাং যুক্তি ও বুদ্ধির বিচারেও আল্লাহপাকের চেয়ে অন্য কেউ প্রিয় হওয়ার যোগ্য নয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ

من عرف الله لم يحب غيره ومن عرف الدنيا زهد فيه

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহপাককে চিনেছে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে অবগত হয়েছে, সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে থাকবে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেনঃ এ দুনিয়ার প্রতিটি কণাই আল্লাহপাকের মা'রেফাতের রাস্তা দেখায়। সৃষ্টি জগতের যে কোন জিনিস নিয়েই বিস্তারিতভাবে চিন্তা করবে, সেই জিনিসই আল্লাহপাকের বড়ত্বকে বুঝাবে।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ আল্লাহপাকের ভালবাসা লাভের তৃতীয় পদ্ধতি হলো, মুখে আল্লাহপাকের যিকির করা। কারণ মানুষ যদি অধিক পরিমাণে আল্লাহপাকের যিকির করে, তাহলে ধীরে ধীরে আল্লাহপাকের মহব্বত অন্তরে পয়দা হয়। যিকির করার সময় এই চেষ্টা করা দরকার যে, মন ও মস্তিষ্ক যেন অধিকাংশ সময় যিকিরেই ব্যস্ত থাকে। অন্য চিন্তায় যেন ব্যস্ত না হয়। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) বলতেনঃ আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের জন্য একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং অন্তরকে নির্ঝঞ্ঝাট ও সংশয়মুক্ত রাখা একান্ত জরুরী। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা এসে যাওয়া ক্ষতিকারক নয়। তবে হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেন, অনাবশ্যক চিন্তা অন্তরের সর্বনাশ করে দেয়।

পরিশেষে একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার যে, 'মহব্বতের মাকাম' হাসিলের আসল পদ্ধতি হলো, কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গের সাহচর্যে দীর্ঘ

দিন থাকা। কোন কামেল পীরের হাতে নিজকে সঁপে দেওয়া ব্যতীত সাধারণতঃ এই মাকাম লাভ হয় না। কারণ হলো, লোকের স্বভাবের বিভিন্নতার কারণে এ সকল মাকাম হাসিলের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। আর কার জন্য কোন পদ্ধতি উপকারী, সেটা কামেল পীরই অনুধাবন করতে পারেন।

মাকামে শওক ও উন্‌ছ

যে সকল বাতেনী আমল বা আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন করা মানুষের জন্য আবশ্যক, তার মধ্য হতে একটি হলো, شوق وانس (শওক ও উন্‌ছ) ইহা তাছাওউফের দু'টি পরিভাষা। شوق (শওক) এর অর্থ হলো, যে সকল উত্তম গুণ এখনো অর্জন হয়নি, সেগুলো অর্জনের জন্য অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। আর انس (উন্‌ছ) শব্দের অর্থ হলো, যে সকল উত্তম গুণ অর্জিত হয়েছে, তাতে অন্তর প্রফুল্ল থাকা। যদি মানুষ তার আধ্যাত্মিক জগতকে ঠিক রাখতে চায়, তাহলে সেটা অন্তরে এ দু'টি বিষয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু অন্তরের অবস্থা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভাবাবেগের এ গোপন জগতে অনেক সময় দু'টি বিপরীত জিনিস একই সাথে চলতে থাকে। এ অবস্থায় অন্তরকে সঠিক অবস্থানে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। ভাল জিনিস অর্জন করার আগ্রহ প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু যদি এই আগ্রহই সীমার বাইরে চলে যায়, তাহলে সেটা অকৃতজ্ঞতা এবং বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌছে যায়। ব্যাপারটা যদি এ পর্যন্ত সীমিত হয় যে, ভাল জিনিসের প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে লাইন ঠিক আছে। কিন্তু যদি এটাকে আরেকটু অগ্রসর করে স্বীয় তাকদীরের (ভাগ্যের) প্রতি অভিযোগ শুরু করা হয়, তাহলে এটাই না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতা হবে। অথবা যদি এ নেয়ামত অন্যের কাছে দেখে অন্তরে অন্তরে জ্বলতে শুরু করে, তাহলে এটাই বিদ্বেষ হয়ে যাবে।

তদ্রুপভাবে কেউ যদি স্বীয় নেক কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং এতে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে তাহলে এটাকে انس (উন্‌ছ) বলা হবে। যা প্রশংসনীয় এবং ঈমানের আলামত। যেমন, হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

اذا سرتك حسنتك وسائتك سيئتك فانت مؤمن (او كما قال)

অর্থাৎ, যখন তোমার নিজের নেক কাজে আনন্দ হবে এবং নিজের অসৎ কাজে দুঃখ হবে, তখন তুমি নিজকে মুমিন মনে করো।

(মুসনাদে আহমাদ ৬ঃ৩৪১, তিরমিযী ২ঃ৩৯)

কিন্তু এক্ষেত্রে যদি সীমালংঘন হয়ে আত্মমুগ্ধতা ও আত্মতৃপ্তির পর্যায়ে এসে যায়, তাহলে এটা عجب (আত্মাশ্লাঘা) হয়ে যাবে, যা সম্ভবত: অন্তঃজগত ধ্বংস হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকরণ।

মোটকথা! নিজের কোন ভাল গুণ তখনই প্রশংসনীয় হবে যখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে যে, আল্লাহপাক স্বীয় দয়া ও রহমতে আমাকে এটা দান করেছেন। আল্লাহর রহমত ব্যতীত আমি যদি এ গুণ অর্জনের চেষ্টা করতাম, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত অর্জন করতে পারতাম না। পক্ষান্তরে যদি কেউ একথা মনে করে সন্তুষ্ট হয় যে, এই প্রশংসনীয় গুণ আমার নিজের কামাই এবং এতে আমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া বুঝে আসে, তাহলে এই আত্মতৃপ্তিই عجب (আত্মশ্লাঘা) হয়ে যাবে এবং সকল আমলকে নষ্ট করে দিবে।

মাকামে রেযা বিলক্বাযা

আত্মার জন্য যে সকল সৎ গুণ অর্জন করা আবশ্যক, তার মধ্য হতে একটি হলো, 'রেযা বিলক্বাযা' (অর্থাৎ, আল্লাহপাকের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা)। এটাই সেই জিনিস, যা বিপদের সময় মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে। এর দ্বারাই মানুষের দুঃখ-বেদনা সুখ ও স্বস্তিতে রূপান্তরিত হয়। 'রেযা বিলক্বাযা'র অর্থ হলো, আল্লাহপাকের পক্ষ হতে মানুষের জন্য যে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, তার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের তাকদীরের প্রতি কোন অভিযোগ না করা। আল্লাহপাকের ফায়সালার প্রতিও কোন অভিযোগ না করা। বরং সুখে-দুঃখে, শান্তি ও বেদনা সর্বাবস্থায় একথা মনে রাখা যে, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যা হয়েছে, এটাই সমীচীন ছিলো। অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, দুঃখে দুঃখিত হওয়া, সুখে সুখী

হওয়াটাতো মানুষের স্বভাব, এটা কিভাবে সম্ভব যে, মানুষ ব্যাথায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যথিত না হয়ে আনন্দ প্রকাশ করবে? যদি কেউ দুঃখেও আনন্দ প্রকাশ করে, তাহলে হয়তো এটা তার অভিনয় হবে নয়তো স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ হবে। এর উত্তর বুযুর্গানে দ্বীন এভাবে দিয়েছেন যে, 'রেযা বিলক্বাযা' এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষের দুঃখ-বেদনার কারণ প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও দুঃখ হবে না বা দুঃখ-বেদনার কারণ প্রকাশ পেলেও সে খুশি হবে। বরং 'রেযা বিলক্বাযা' এর অর্থ হলো, মানুষ তার তাকদীর (ভাগ্য) এর প্রতি কোন অভিযোগ করবে না, আল্লাহ্পাকের ফায়সালার প্রতি অভিযোগ করবে না। তা না হলে দুঃখ-বেদনাকে দুঃখ-বেদনা মনে করা 'রেযা বিলক্বাযা' এর পরিপন্থী নয়। অবশ্য কোন কোন সূফিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে 'রেযা বিলক্বাযা' বিশেষ অবস্থারূপে প্রকাশ পায়। সে সময় এই অবস্থাটা তাদের প্রায় স্বভাবে পরিণত হয়। তখন তারা বাস্তবিক পক্ষেই দুঃখ-বেদনায় কষ্ট বোধ করেন না। তারা বিপদ-আপদেও সুখ অনুভব করেন। সুতরাং যে সকল বুযুর্গ সম্পর্কে শোনা যায় যে, তারা দুঃখের কারণ প্রকাশ পেলেও খুশি হন। এটা তাদের বিশেষ অবস্থা মনে করতে হবে। এই অবস্থাটা ভাল এবং প্রসংশনীয়। কিন্তু শরী'অতে এটা উদ্দেশ্য নয়।

মোটকথা, 'রেযা বিলক্বাযা' দ্বারা আসল উদ্দেশ্য হলো, দুঃখ-বেদনার অবস্থায়ও যেন মুখ অথবা অন্তর থেকে কোন অভিযোগ ও আপত্তিকর বাক্য নির্গত না হয়। বরং দুঃখ-বেদনার সময়ও সর্বদা যবান আল্লাহপাকের শোকর ও প্রসংশায় লিপ্ত থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে উৎসাহিত করেছেন যে, যখন কেউ বিপদগ্রস্ত হবে, তখনও পড়বেঃ

الحمد لله على كل حال

অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সকল প্রসংশা আল্লাহ্র জন্য। (ইবনে মাজাহ ২৬৯)

আল্লাহপাক যে অবস্থায় রাখেন সেটাই ভাল

উপরোক্ত শিক্ষার যৌক্তিকতা এই যে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি একেবারে সীমিত। প্রকৃত পক্ষে মানুষ তার মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝতে পারে

না। অনেক সময় মানুষ কোন জিনিসকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে, অথচ বাস্তবে তা তার জন্য ক্ষতিকারক হয়। অথবা কোন জিনিসকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, অথচ বাস্তবে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। মানুষ যদি তার চারপাশে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে এ কথার হাজারো সাক্ষ্য সে তার দৈনন্দিন জীবনে পেয়ে যাবে।

এক রেল যাত্রীর কাহিনী

অবিভক্ত হিন্দুস্তানের সময়ের কথা। এক ব্যক্তি 'ব্রেলী' ষ্টেশন থেকে 'তুফান মেল' নামক রেল গাড়ীতে আরোহণ করার অভিপ্রায়ে ষ্টেশনে এলো। এ গাড়ী ব্রেলীতে গভীর রাতে এসে পৌঁছতো। এ লোক গাড়ীর অপেক্ষায় কিছুক্ষণ বসে থেকে ষ্টেশন মাষ্টারকে জাগিয়ে দেওয়ার কথা বলে ওয়েটিং রুমে (বিশ্রাম কক্ষে) শুয়ে পড়লো। ঘটনাক্রমে ষ্টেশন মাষ্টার গাড়ী আসার পর তাকে ডাকতে ভুলে গেলো। এদিকে গাড়ী এসে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর যখন এ ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে শুনলো যে, গাড়ী এসে চলে গেছে অথচ তাকে জাগানো হয়নি, তখন ষ্টেশন মাষ্টারের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সংবাদ পৌঁছলো যে, এই গাড়ী এখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পরই মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এ ব্যক্তি গাড়ী চলে যাওয়াকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো যে, যদি গাড়ী চলে না যেতো, তাহলে তার জীবনই চলে যেতো।

এই ঘটনায়তো সামান্যক্ষণ পরই এই ব্যক্তি বুঝতে পারলো যে, নিজের জন্য যেটা সে মঙ্গলজনক মনে করেছিলো, তা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য ক্ষতিকর ছিলো। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, মানুষ বুঝতেও পারে না যে, কোনটা মঙ্গল আর কোনটা অমঙ্গল।

শিশু কাহিনী

আমার বড় ছেলে মুহাম্মদ যাকী যখন ছোট ছিলো, সে সময়ের কাহিনী। একদিন আমি (দূর থেকে) তাকে দেখলাম যে, সে বাড়ীর ছাদে একেবারে কিনারায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। অবস্থা এমন যে, সে যদি সামান্য আরেকটু ঝুঁকে, তাহলে নিচে পড়তে আর দেরী হবে না। আমি চিন্তা করলাম, এখন যদি নিচ থেকে

ডেকে তাকে সতর্ক করতে যাই, তাহলে হয়তো ভয় পেয়ে সে পড়েই যাবে। তাই আমি কিছু না বলে চুপিসারে ছাদে উঠে পিছন দিক দিয়ে আস্তে আস্তে কোন প্রকার শব্দ না করে তার কাছে গিয়ে, পিছন থেকে ঝটকা মেরে তাকে এমন জোরে নিজের দিকে টান দিলাম যে, সে ভেতরের দিকে এসে পড়ে গেলো এবং কাঁদতে আরম্ভ করলো। সে হয়তো ভাবলো, আব্বা আমার প্রতি জুলুম করলেন,, ঝটকা মেরে টেনে ফেলে দিলেন। কিন্তু বাস্তবে এই জুলুমই (?) তার জীবন রক্ষার কারণ হলো। সে শিশুকাল পর্যন্ত এটা বুঝতেই পারলো না যে, আব্বা আমার উপর এ জুলুম (?) কেন করলেন। কাজেই এ দুনিয়ার যে সকল ঘটনায় আমরা দুঃখিত হই এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে মজলুম মনে করি, বাস্তবে এ ঘটনার সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ এমন হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল ব্যাপার আমাদের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে এবং এতে আল্লাহপাকের বিরাট হেকমত নিহিত আছে। কোনটার ব্যাপারে আমরা পরবর্তিতে জানতে পারি আর কোনটা আমাদের অজানাই থেকে যায়।

সর্বদা যদি মানুষের অন্তরে তার অজ্ঞতার অনুভূতি জাগ্রত থাকে, তাহলে সে সর্বদা আল্লাহপাকের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত থাকতে পারবে। এমন মনুষের অন্তরে কখনো আল্লাহপাকের ফায়সালা এবং স্বীয় তাকদীরের প্রতি অভিযোগ সৃষ্টি হবে না।

সুতরাং 'রেযা বিলকাযা' এর এই মহান গুণ অর্জন করার পন্থা হলো, ঘটনাবলী নিয়ে গভীরভাবে এই চিন্তা করা যে, অনেক ঘটনার শুরুতে মানুষ তাকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, অথচ পরবর্তীতে সেটাই তার জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে।

যে সকল জিনিস অন্তরকে ধ্বংস করে

এ পর্যন্ত বাতেনী আমলের ফরয সমূহের (যা অর্জন করা মানুষের জন্য আবশ্যক) আলোচনা করা হলো। সূফীয়ায়ে কেরাম এগুলোকে 'ফাযায়েল' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) এ সকল ফাযায়েলের নামকরণ করেছেন منجيات (মুক্তির উপকরণ) বলে। এ সকল বিষয়ের বিপরীতে বাতেনী আমলসমূহের মধ্যে কিছু আমল আছে হারাম এবং না জায়েয। সূফীয়ায়ে কেরাম এগুলোকে رذائل (দোষসমূহ) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) এগুলোকে مهلكات (ধ্বংসের উপকরণ) বলে নামকরণ করেছেন।

সুলূক ও তরীকত তথা খোদাপ্রাপ্তির পথের সারাংশ দু'টি জিনিস। ফাযায়েল (উত্তম গুণাবলী) হাসিল করা, যাকে তাছাওউফের পরিভাষায় تحليه বলে এবং رذائل (দোষসমূহ) হতে মুক্ত হওয়া, যাকে সুফিয়ায়ে কেরাম تخليه বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ ব্যাপারে মাশায়েখদের (পীর সাহেবদের) মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে যে, আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য تحليه (অর্থাৎ, উত্তম গুণাবলী অর্জন করার কাজটি) আগে করতে হবে? নাকি تخلية (অর্থাৎ দোষসমূহ ত্যাগ করার কাজটি) আগে করতে হবে? কোন কোন মাশায়েখের মত হলো, সালেক (আল্লাহ্‌র পথের পথিক)কে সর্ব প্রথম تخليه (দোষ মুক্ত হওয়া) এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে অন্তরকে দোষমুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। অতঃপর تحليه অর্থাৎ ফাযায়েল তথা সৎ গুণাবলী অর্জন করা সহজ হবে। এ মতের অনুসারীগণ এই দৃষ্টান্ত পেশ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন জমিতে ফল বা ফুলের চাষ করতে চায়, তাহলে তার এ

উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রথমে জমিতে হাল চালিয়ে আবর্জনা ও আগাছা সাফ করে জমি তৈরী করতে হবে। তারপর যদি সেই জমিতে ফল বা ফুলের বীজ বপণ করা হয়, তাহলেই তা ফলদায়ক হবে, অন্যথায় নয়। অদ্রুপ কোন ব্যক্তি যদি তার আধ্যাত্মিক জগতে ফাযায়েল তথা সৎ গুণাবলীর বাগান করতে চায়, তাহলে তার অন্তর নামক জমি হতে رذائل বা দোষসমূহ নামক ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। অতঃপর যদি فضائل বা সৎ গুণাবলীর বীজ বপন করা হয়, তাহলে ফুলে ফলে সুশোভিত বাগান করতে সক্ষম হবে।

মাশায়েখদের অন্য আরেক শ্রেণীর মত হলো, فضائل (সৎ গুণাবলী) আগে অর্জন করতে হবে। অতঃপর رذائل (দোষসমূহ) দূর করতে হবে। তাঁরা বলেনঃ رذائل (দোষসমূহ) অন্ধকারের ন্যায়। আর فضائل (গুণসমূহ) আলোর ন্যায়। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি অন্ধকার দূর করতে চায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন চেরাগ জ্বালাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার দূর হবে না। চেরাগ জ্বালানোর সাথে সাথেই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। ঠিক এরূপভাবে অন্তরজগত থেকে رذائل এর অন্ধকার ঐ সময় পর্যন্ত দূর হবে না, যে সময় পর্যন্ত অন্তরে فضائل এর চেরাগ প্রজ্জ্বলিত করা না হবে। যখনই অন্তরে فضائل এর চেরাগ জ্বলে উঠবে, তখনই رذائل এর অন্ধকার নিজে নিজেই দূরীভূত হবে।

মোটকথা উভয় পদ্ধতিই মাশায়েখদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যে সকল মাশায়েখ تخلية (দোষসমূহ বর্জন) করাকে تحلية (গুণসমূহ অর্জন) এর উপর অগ্রগণ্য মনে করেন, তাঁরা শুরুতে যিকির ও অযীফার পরিবর্তে এমন সব আমলী মুজাহাদা (কর্ম সাধনা)-এর উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, যার দ্বারা নফসের খাহেশাত (প্রবৃত্তির চাহিদা ও বাসনা) এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে যে সকল মাশায়েখ تحليه (সৎ গুণাবলী অর্জন করাকে) تخليه (দোষ বর্জন) এর উপর অগ্রগণ্য

মনে করেন, তাঁদের অধিক মনোযোগ যিকির-আযকার, দু'আ-দুরূদ ও অযীফার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তবে বাস্তব কথা এই যে, এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটি কার জন্য উপকারী এর ফায়সালা একমাত্র কামেল শাইখই করতে পারেন।

সকল দোষের মূল

এ যাবত আমরা فضائل (গুণাবলী) এর আলোচনা করেছি। এখন সংক্ষেপে رذائل (দোষসমূহ) এর আলোচনা করবো। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটি কথা মনে গেঁথে নেওয়া দরকার। আর তাহলো, অন্তরের সকল রোগের মূল এবং সকল দোষের মূল হলো, প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনা চরিতার্থের প্রচেষ্টা। কুরআনে কারীমের পরিভাষায় এটাকে اتباع هوى (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনার অনুসরণ) বলে আখ্যায়িত করেছে। অন্তরের যে রোগ নিয়েই আপনি চিন্তা করবেন, দেখবেন তার মূল কারণ এটাই যে, মানুষ তার প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনার সামনে আত্মসমর্পণ করে অসহায় সেজে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে তার দ্বারা কোন পাপ কাজও হয় না এবং তার অন্তরে কোন আধ্যাত্মিক রোগও জন্ম নেয় না। এজন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বার বার তাকীদ করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, (কারণ) তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। (সূরা ছোয়াদ ২৬ আয়াত)

কাজেই কোন ব্যক্তি যদি চায় তার অন্তর আভ্যন্তরীণ (বাতেনী) রোগ মুক্ত হোক এবং তার সকল আধ্যাত্মিক দোষ বিনাশ হয়ে যাক, তাহলে তাকে সর্ব প্রথম নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কুরআনে কারীমের আয়াত নিয়ে গবেষণা করার ফলে নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার তিনটি পদ্ধতি বুঝে আসে। একটি পদ্ধতি সাধারণ

এবং সংক্ষেপ। অপর দু'টি বিশেষ এবং বিস্তারিত। সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো, অন্তরে আখিরাতের চিন্তা এবং আল্লাহপাকের নিকট জবাবদিহিতার কথা সব সময় জাগ্রত রাখা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি (মতো চলা) থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাযি'আত ৪০-৪১)

এ আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হলো, অন্তরে আল্লাহপাকের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় সৃষ্টি করা। এ কথাতো প্রতিটি মুসলমানই জানে যে, মৃত্যুর পর আমাকে একদিন আল্লাহপাকের সামনে দাড়াতে হবে। কিন্তু এ কথাটি যত বড় সত্য, দৃষ্টি হতে এটা বিচ্যুতও হয় ততবেশী। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জরুরী হলো, এ বাস্তব বিষয়টিকে অন্তরের মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে নেওয়া যে, কোন সময়ই যেন আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার কথাটি অন্তর থেকে মুছে না যায়। আর এটা মউতের ধ্যান (মুরাকাবাহ্) দ্বারা হাসিল করা যায়। প্রতিটি লোকেরই উচিত যে, প্রতিদিন কমপক্ষে একবার পাঁচ/দশ মিনিট নিজের মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করা। সাথে সাথে প্রতিদিনের আলাপ চারিতায় মৃত্যুর আলোচনাকে আবশ্যক করে নেওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اكثروا ذكر هاذم اللذات

অর্থাৎ, সকল স্বাদ বিনাশকারী অর্থাৎ, মৃত্যুর আলোচনা অধিক পরিমাণে করো। (তিরমিযী ২ঃ৫৭, নাসায়ী ১ঃ ২০২)

মৃত্যুর আলোচনা অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের চিন্তা জাগ্রত করবে। আর এর আবশ্যম্ভাবী ফল এই হবে যে, স্বীয় নফসের খাহেশাত (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনা) এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। এটা নফসের অনুসরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সাধারণ চিকিৎসা। এছাড়া প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা (নফসের খাহেশাত) থেকে যে

সকল গোমরাহী সৃষ্টি হয়, তা দুই প্রকার। (১) شبهات অর্থাৎ, চিন্তা-চেতনা (দৃষ্টি ভঙ্গিগত) ও মতবাদগত পথভ্রষ্টতা। (২) شهوات অর্থাৎ, আমল ও কর্মগত পথভ্রষ্টতা। পবিত্র কুরআনে প্রথম প্রকারের পথভ্রষ্টতার চিকিৎসা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছেঃ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দাও। (সূরা আস্‌র ২)

দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও। (সূরা আসর ৩ আঃ)

ধৈর্যের অর্থ হলো, নফসের কামনা-বাসনা চরিতার্থ না করার দরুণ যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করা। আর সত্যি বলতে কি নেক লোকদের সংসর্গে (দীর্ঘদিন) অবস্থান করা ব্যতীত এ গুণ সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে পয়দা হয় না। এ কারণেই 'বুযুর্গানে-দ্বীন' সাধারণতঃ আত্মশুদ্ধির জন্য কোন কামেল শাইখের নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়া জরুরী মনে করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সংসর্গে থাকো। (সূরা আত-তাওবাহ ১১৯)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, খোদাভীতি অর্জন এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হলো, সত্যবাদী অর্থাৎ নেককার লোকদের সোহবতে থাকা।

যবানের আপদসমূহ

আকাবির উলামায়ে কিরামের প্রসিদ্ধ কথা যে,

جرمه صغير وجرمه كبير

অর্থাৎ, উহার (যবানের) শরীর (আকৃতি) ছোট, কিন্তু এর অন্যায় অনেক বড়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য হতে জিহ্বা নামক এই ক্ষুদ্র অঙ্গ থেকে যে পরিমাণ গোনাহ্ প্রকাশ পেয়ে থাকে, সম্ভবতঃ অন্য কোন অঙ্গ হতে এত অধিক পরিমাণ গোনাহ্ প্রকাশ পায় না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে একবার দেখা গেলো যে, তিনি স্বীয় জিহবাকে ধরে মোচড়াচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, এরূপ কেন করছেন? উত্তরে বললেনঃ ان هذا اوردني الموارد

অর্থাৎ, এই জিনিসটি (যবান) আমাকে ধ্বংসের অতল গহবরে ঠেলে দিচ্ছে।
(মুআত্তা মালেক (রহঃ) ৩৮৭)

যবান দ্বারা যত গোনাহ হয়, তার মধ্যে কিছুতো এমন আছে, যাকে সকলেই গোনাহ মনে করে থাকে। যেমন, মিথ্যা কথা বলা, গালী দেওয়া, গান-বাদ্য করা ইত্যাদি। প্রতিটি মুসলমানই জানে যে, এ সকল কাজ হারাম ও নিষিদ্ধ। এ সকল কাজ কেউ যদি করে, তাহলে গোনাহ মনে করেই করে। এ কাজ করার সময় মনে মনে লজ্জাবোধ করে। ফলে আশা করা যায় যে, কোন সময় হয়তো সে এ গোনাহ্ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু যবানের কিছু মারাত্মক গোনাহ্ এমনও আছে, যেগুলো সম্পর্কে লোকেরা ধারণাও করতে পারে না যে, এ সকল গোনাহ্ এমন মারাত্মক। আর যখন রোগী তার রোগই অনুভব করতে পারে না, তখন তার চিকিৎসাই বা কি হবে? এজন্য এ সকল গোনাহ্ আরো বেশী মারাত্মক। এটা মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে। নিম্নে আজ এ ধরনের কিছু গোনাহের আলোচনা করা হচ্ছে।

জিহবার প্রথম আপদ ঃ অহেতুক কথা

জিহবা একটি কুদরতী মেশিন। যা আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় মানুষকে দান করেছেন। যাতে মানুষ এ মেশিন এমন কাজে ব্যবহার করতে পারে, যা তার দ্বীন অথবা দুনিয়ার জন্য উপকারী হবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি জিহবাকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যেটা তার দ্বীনের দিক দিয়েও উপকারী নয়, দুনিয়ার দিক দিয়েও উপকারী নয়, তাহলে এটা জিহবার অপব্যবহার বলে গণ্য হবে। আর ইসলাম এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করেছে। অহেতুক ও অর্থহীন আলোচনায় জিহবাকে ব্যবহার করা সর্বদিক দিয়ে ক্ষতিকর। এ

কারণেই হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

كان صلى الله عليه وسلم نزر الكلام طويل الصمت

অর্থাৎ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বল্পভাষী এবং অধিক নিরবতা পালনকারী ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৬ঃ৮৯)

ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে কিতাবে লিখা আছে যে, তিনি তাঁর আংটিতে একথা খোদাই করিয়েছিলেনঃ

قل الخير والا فاصمت

অর্থাৎ, ভাল কথা বলো, অন্যথায় চুপ থাকো।

আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুছাইন সাহেব (রহঃ) যিনি 'মিয়া সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আশ্চর্য ধরনের বুযুর্গ ছিলেন। আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হওয়ার পর বললেনঃ আজ কথাবার্তা আরবী ভাষায় হবে। যেহেতু এর পূর্বে কোনদিন তিনি এ ধরনের প্রস্তাব করেননি, তাই আমি একটু আশ্চর্যান্বিত হলাম। তিনি বুঝতে পেরে নিজেই এর কারণ বর্ণনা করলেন। তিনি বললেনঃ যেহেতু তুমিও সাবলীলভাবে আরবী বলে অভ্যস্ত নও এবং আমিও নই। কাজেই এতে কথা কম বলা হবে। অতঃপর বললেনঃ আমাদের দৃষ্টান্ত ঐ মুসাফিরের ন্যায় যার টাকায় ভরা থলি প্রায় শেষ। এ অবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি এক একটি টাকা খুবই হিসেব করে খরচ করে থাকে। কাজেই আমাদেরও উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে খুবই হিসেব করে খরচ করা।

জিহ্বার দ্বিতীয় আপদ ঃ অহেতুক বিতর্ক

অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হওয়াটা যদিও অহেতুক কথাবার্তার একটি প্রকার। কিন্তু অহেতুক বিতর্কে সাধারণ মানুষের তুলনায় শিক্ষিত লোকেরাই বেশী লিপ্ত হয়ে থাকে। অহেতুক তর্ক-বিতর্ক বলা হয় এমন তর্ক-বিতর্ককে, যাতে দুনিয়া বা দ্বীনের কোন ফায়দা নেই। আর যে বিতর্ক সত্যকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য হয়ে থাকে এ ধরনের

বিতর্ক শুধু যে কেবল জায়েয তাই নয়, ররং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তমও বটে। কেননা এ ধরনের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া প্রকৃত তালিবে ইলমের (ছাত্রের) বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ফারসী প্রবাদ আছে।

"طالبے علمے کہ چون وچرا نہ کند وصوفی کہ چون وچرا کند،

ہر دورا بہ چراگاہ باید رفت"

অর্থাৎ, যে ছাত্র উস্তাযকে কোন প্রশ্ন করে না, একেবারে চুপচাপ বসে থাকে এবং যে মুরীদ পীর সাহেবের কথার উপর প্রশ্ন করে, (এদের কেউই সফল হবে না।) কাজেই উভয়ের উচিত, বসতী ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চারণভূমিতে চলে যাওয়া এবং রাখালের কাজ করা। আমি এখানে ঐ বিতর্কের কথা বলছি, যা অনর্থক।

একবার হযরত নেযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর নিকট সুদূর 'বল্‌খ' থেকে দু'জন আলেম আসলেন। উভয়ে যখন হাউজের নিকট উযূ করতে বসলেন, তখন এই বিতর্কে লিপ্ত হলেন যে, এই হাউজটি বড়? না বলখের অমুক হাউজ বড়? উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে দলীলাদি পেশ করতে শুরু করলেন। একথা হযরত নেজামুদ্দীন (রহঃ) জানতে পারলেন। নামাযের পর যখন উভয় বুযুর্গ হযরতের খিদমতে হাযির হয়ে নিজেদের আগমনের কারণ হিসেবে হযরত থেকে নিজেদের ইসলাহ–আত্মশুদ্ধি করানো ও ফয়েয লাভের কথা বললেন, তখন হযরত নেযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) বললেনঃ তোমাদের বিতর্কের কি ফায়সালা হলো? কোন্ হাউজ বড়? উভয়ে নীরব থাকলো এবং হযরতের কথার কোন উত্তর দিলো না। তখন হযরত নেযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) বললেনঃ তোমাদের (আধ্যাত্মিক রোগ অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার) চিকিৎসা হলো, তোমরা প্রথমে উভয় হাউজের (দিল্লী ও বলখের) পরিমাপ করে নিজেদের বিতর্কের ফায়সালা করো, অতঃপর অন্য কথা।

আজ-কাল সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ রোগ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বীন-ধর্মের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেতো কোনই ধারণা নেই, কিন্তু অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমাকে যখন কেউ কোন অহেতুক ও নিরর্থক প্রশ্ন করে, আমি তার উত্তরে এ হাদীছ লিখে দেই,

من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه

অর্থাৎ, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে অনর্থক কথা-বার্তা ত্যাগ করবে। (তিরমিযী শরীফ, হাদীছ নম্বর ২৩১৮)

জিহ্বার তৃতীয় আপদ ঃ ঝগড়া-বিবাদ

যে সকল বিতর্ক জায়েয এবং উপকারী, সেগুলোর ক্ষেত্রে একটি বড় বিপদ হলো, ঝগড়া-বিবাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। আজকাল এ ব্যাধি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, উচ্চ পর্যায়ের ইলমী এবং উপকারী বিতর্কের মধ্যেও এক পক্ষ অপর পক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে বিদ্রুপাত্মক বিশেষণ দ্বারা আখ্যায়িত করতে না পারলে এটাকে বিতর্কই মনে করা হয় না। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভদ্র (?) গালীও প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এ ধরনের মোক্ষম গালী প্রয়োগ করতে পারাটাকে বড় যোগ্যতা ও শিল্প মনে করা হয়, অথচ ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ

المراء فى العلم يذهب بنور الايمان

অর্থাৎ, ইলমের ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া ঈমানের নূরকে ধ্বংস করে দেয়। (সিয়ারু ই'লামিন্ নুবালা ৭ঃ৪১৮)

(একথা শুনে) এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলোঃ কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে সুন্নাতের খেলাফ কোন কাজ করতে দেখে, তাহলে কি করবে? ইমাম মালেক (রহঃ) উত্তর দিলেনঃ নম্রভাবে তাকে বুঝিয়ে দিবে। ঝগড়া করবে না।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের বিদ্রুপাত্মক বাক্য বানে মুসলমানের মনে ব্যাথা দেওয়ার মত (মারাত্মক) গোনাহতো আছেই, এছাড়া এর একটি মারাত্মক সামাজিক ক্ষতি এই যে, এতে মুসলমানদের পরস্পরে অনৈক্য, বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও দলবাজীর শিকড় মজবুত হয়। যদি ইলমী ও ধর্মীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে ইলমী ও ধর্মীয় নিয়ম-নীতির পূর্ণ অনুসরণ করা হয়, তাহলে আমার একান্ত আত্মবিশ্বাস যে, মুসলিম সমাজের বর্তমান অনৈক্য ও দলবাজী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

মুজাহাদা বা সাধনা

বিগত এক আলোচনায় বলা হয়েছিলো যে, মানুষের অন্তরে যে সকল কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়, তা দুই প্রকার। (১) হুকূকে নফ্স এবং (২) হুযূযে নফ্স।

হুকূকে নফস ঐ সকল জিনিসকে বলে, যে সকল জিনিসের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। যেমন, পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, চলা-ফেরা এবং প্রয়োজন অনুসারে বৈধভাবে যৌন চাহিদা মিটানো। এসবই হুকূকে নফসের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল চাহিদা পূরণ করা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ফরয এবং ওয়াজিবও হয়ে থাকে। এ সকল হুকূক পূর্ণ না করা বৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

হুযূযে নফ্সঃ নফসের এমন সম্ভোগকে (চাহিদাকে) বলা হয়, যা মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত। তাছাওউফের পরিভাষায় نفس كشى (রিপু দমন) এবং مخالفت نفس (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধাচারণ) বলতে এ সকল কামনা-বাসনা ও সম্ভোগ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, মানুষ যেন অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। এ বিষয়ের প্রতিই পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা আন-নাযিআত ৪০-৪১)

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় هوى শব্দটি هدى শব্দের বিপরীতে ব্যবহার হয়, আর এ هوى শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, যা হুযূযে নফসের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই مجاهدات ও رياضت তথা কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

মুজাহাদা বা সাধনার অর্থ হলো, নাজায়েয এবং গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু কিছু জায়েয কাজ ত্যাগ করার অভ্যাস করা। এ ধরনের মুজাহাদা বা সাধনা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বরং যখন নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এ সকল মুজাহাদাও পরিত্যাগ করা হয়।

হযরত গাংগুহী (রহঃ) মুজাহাদা বা সাধনার দৃষ্টান্ত কাগজের ঐ মোড়ানো পাতার দ্বারা দিয়েছেন যাকে হাজার বার চেষ্টা করেও ঠিক করা সম্ভব হয় না, কিন্তু সামান্য সময় যদি বিপরীত দিকে মুড়িয়ে রাখা হয় তাহলে তা সোজা হয়ে যায়। তদ্রুপ মুজাহাদা বা সাধনার আসল উদ্দেশ্য হলো, নফসকে (প্রবৃত্তিকে) হালাল জিনিসে অভ্যস্ত করা। কিন্তু যে নফস হারাম জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাকে তখনই হালাল জিনিসে অভ্যস্ত করা যাবে, যখন কিছুদিনের জন্য তাকে জায়েয এবং হালাল জিনিস থেকেও দূরে রাখা হবে। এজন্যই হযরত উমরে ফারুক (রাযিঃ) বলতেনঃ

ترکت تسعة اعشار الحلال خشية الربا

অর্থাৎ, আমরা (মুসলমানগণ) হারামের ভয়ে হালালের দশ অংশের মধ্য হতে নয় অংশকেই ত্যাগ করেছি। (কানযুল উম্মাল ৪ঃ১৮৭)

আর এটা প্রকৃতপক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীরই সারাংশঃ

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ومن حال حول الحمى اوشك ان يقع فيه او كما قال صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, হালাল এবং হারাম (উভয়ই) স্পষ্ট। এ দুটির মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত জিনিস আছে। আর যে ব্যক্তি চারণভূমির আশে-পাশে ঘুরে (অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত জিনিস ব্যবহার করে) সে ঐ চারণভূমিতে (অর্থাৎ হারামে) লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী হয়।

(সহীহ বুখারী ১ঃ১৩, সহীহ মুসলিম ২ঃ২৮)

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, ঠিকমতো জামা'আতের পাবন্দী (যে, তাকবীরে উলাও যেন ছুটতে না পারে) তখনই সম্ভব হয়, যখন 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামাযের অভ্যাস করা হয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামাযের (যেটা একান্ত নফল) পাবন্দী এ উদ্দেশ্যে করে যে, এতে করে সে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ে সমর্থ হবে, তাহলে এটাকেই মুজাহাদা বলা হবে। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি হারাম এবং অবৈধ কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য নিজেকে স্বল্পভাষী বানিয়ে নেয়, তাহলে এটাকেও মুজাহাদা বলা হবে।

পূর্ব যুগে সূফিয়ায়ে কেরাম এ উদ্দেশ্যে কঠিন কঠিন মুজাহাদা-সাধনা করতেন। বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট চারটি মুজাহাদার প্রচলন রয়েছে।

(১) ترك طعام খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করা।

(২) ترك منام নিদ্রাভ্যাস ত্যাগ করা।

(৩) ترك كلام কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা।

(৪) ترك اختلاط مع الانام মানুষের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করা।

এ যুগের মুজাহাদা বা সাধনা

কিন্তু যেহেতু আমাদের এ যুগের মানুষের শারীরিক গঠন এ ধরনের কঠোর মুজাহাদা বা সাধনা সহ্য করতে পারবে না, এজন্য আমাদের শাইখ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এ সকল মুজাহাদার (সাধনার) মধ্য হতে ترك (পরিত্যাগ) শব্দকে تقليل (স্বল্প করণ) শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত বলতেন, এ যুগে যদি পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। এজন্য এ যুগের মুজাহাদা হলো, উপরোক্ত বিষয়গুলোতে প্রয়োজনানুসারে স্বল্পতা সাধন করা। এক্ষেত্রেও হযরত থানভী (রহঃ)

বলতেন যে, আমি পানাহার এবং নিদ্রা কম করার ব্যাপারে জোর দেই না। কারণ এর সীমা সম্পর্কে অবগত হওয়া পীর সাহেবের জন্যও মুশকিল হয়ে থাকে। কেননা মুরীদের (শারীরিক ও মানসিক) অবস্থার যথাযথ অবগতি ব্যতীত এগুলোর মধ্যে স্বল্পতা করলে অনেক সময় স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। অবশ্য হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে অপর দুটি বিষয় অর্থাৎ, تقليل كلام (কথাবার্তা কমিয়ে দেওয়া) এবং تقليل اختلاط مع الانام (মেলা-মেশা কম করা) এর উপর কঠোরভাবে পাবন্দী করা হতো। অর্থাৎ, হযরত থানবী (রহঃ) স্বীয় মুরীদদেরকে কথাবার্তা কম বলতে এবং মানুষের সাথে মেলামেশা কম করার প্রশিক্ষণ দিতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় আমল ও আখলাক সংশোধন করতে চায়, তার জন্য এ দুটি বিষয়ে মুজাহাদা (সাধনা) করা আবশ্যক। এ দুটি বিষয়ে মুজাহাদা করার নিয়ম পূর্বের লোকদের মধ্যেও দেখা যায়। হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) তার আংটিতে এ কথাটি খোদাই করিয়ে ছিলেন। قل الخير والا فاصمت অর্থাৎ, ভাল কথা বলো, অন্যথায় চুপ থাকো।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) থেকে দু'টি বিপরীতধর্মী বাক্য প্রসিদ্ধ আছে।

প্রথম বাক্য اقلل من معرفة الناس। অর্থাৎ, মানুষের সাথে পরিচয় কম করো।

দ্বিতীয় বাক্য اكثر من معرفة الناس। অর্থাৎ, মানুষের সাথে পরিচয় বেশী করো।

প্রকৃতপক্ষে এ দুটি কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ প্রথম বাক্যে মানুষ বলতে ঐ সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের দিক থেকে গাফেল। আর দ্বিতীয় বাক্য ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনদার এবং আল্লাহপাকের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

এ সকল মুজাহাদা পালনকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আর সে কথাটি এই যে, মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা নিঃসন্দেহে মুজাহাদার অংশ। কিন্তু এক্ষেত্রে কখনো যেন এ নিয়ত না হয় যে, লোকেরা খারাপ এজন্য তাদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত থাকি। কেননা এ নিয়ততো অহংকার ও আত্মম্ভরিতারই অপর নাম। বরং অন্য লোক থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে এ নিয়ত করা উচিত যে, আমার আমল খারাপ, আমি আত্মার রোগে আক্রান্ত, আমার এ রোগে অন্য কেউ যেন আক্রান্ত না হয়, এজন্য আমি লোক থেকে দূরে থাকি। পক্ষান্তরে কারো মনে যদি একথা আসে যে, অন্যেরা আমার চেয়ে খারাপ এবং আমার চেয়ে বেশী পাপী এজন্য তাদের থেকে দূরে থাকি, তাহলে এ ধরনের অহংকারের চেয়ে বাজারের লোকদের সাথে চলাফেরা করাও ভাল।

মোটকথা! কম কথা বলার এবং লোকজনের সাথে কম মেলামেশার অভ্যাস করলে সময়ও বাঁচবে এবং এভাবে অনেক গোনাহ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

মুজাহাদা বা সাধনার পর আমলের সংশোধনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। সে বিষয়ের আলোচনা আগামীতে হবে ইনশাআল্লাহ।

আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ ঃ তাওবা

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

অর্থাৎ, শতবার যদি তাওবা ভঙ্গ করে থাকো, তবুও ফিরে এসো।

কোন লোক যদি চায় যে, তার আভ্যন্তরীণ জগত সুস্থ হোক এবং তার সকল আধ্যাত্মিক রোগ দূর হয়ে যাক, সে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করে দোযখের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করুক, তাহলে এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো তাওবা। এ কারণে আজকের মাহফিলে এ সম্পর্কেই কয়েকটি জরুরী কথা আরয করা হবে।

সাধারণভাবে লোকেরা তাওবা বলতে একথা বুঝে যে, কেবলমাত্র মুখে أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ পড়া। অথচ এটা একটা মারাত্মক ধরনের ভুল ধারণা। কারণ তাওবার প্রকৃত অর্থ হলো, বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। যতটুকু সম্ভব তার ক্ষতিপূরণ করা এবং ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় পণ করা।

ইমাম গাযালী (রহঃ) এ কথাটি খুবই সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেনঃ এ দুনিয়ায় ভাল-মন্দ মিলে-মিশে থাকে। ঐ সকল জিনিসের মধ্যে তাকওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার উপকরণ যেমন আছে, তেমনি পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি আকর্ষণ করার উপকরণও আছে। অনেক জিনিস এমন আছে, যা আপনাকে নেক ও ছওয়াবের কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অনেক জিনিস এমন আছে যা আপনাকে গোনাহের কাজের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব হলো, গোনাহের চাহিদাকে পরাজিত করে নেক কাজের আগ্রহকে বিজয়ী করা। তিনি আরো বলেন, এর দৃষ্টান্ত হলো ঐ স্বর্ণ যার মধ্যে 'খাদ' মিলানো আছে। এ স্বর্ণকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করতে হলে এ স্বর্ণ থেকে খাদকে পৃথক করতে হবে। আর এজন্য একমাত্র উপায় হলো, আগুনে তাপ দিয়ে এই স্বর্ণকে গলানো। আগুনের তাপে স্বর্ণকে গলানো হলেই

খাদ মুক্ত করা যাবে। অন্যথায় নয়। ঠিক এরূপভাবেই মানুষের নেকীকে বদী থেকে পৃথক করার জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। এই তাপ যা মানুষকে ভেজালমুক্ত করে, তা দুই প্রকার। একটি হলো দোযখের আগুনের তাপ। কারণ মুমিন ব্যক্তিকে যদি জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হয়, তাহলে তা কেবল তাকে পাপ-পঙ্কিলতার ভেজাল মুক্ত করার জন্যই হবে। শুধু শাস্তির জন্য নয়। বরং এভাবে পাক-সাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করানোই উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং জ্বালানোর উদ্দেশ্যেই স্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ وَهَلْ نُجَازِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ

অর্থাৎ, আমি কাফের ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা সাবা ১৭)

অপরটি হলো, আফসোস ও অনুশোচনার তাপ। এটা এমন তাপ যা এ দুনিয়াতেই ভেজালকে গলিয়ে খাঁটি জিনিষ হতে পৃথক করে থাকে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেনঃ মানুষকে ভেজালমুক্ত হওয়ার জন্য এই দুই প্রকার তাপ হতে কোন না কোন প্রকার তাপে অবশ্যই দগ্ধ হতে হবে। এখন (তার ইচ্ছা) সে যদি চায় তাহলে নিজের জন্য জাহান্নামের আগুনকে অবলম্বন করতে পারে। আর যদি এটা তার কাছে কষ্টকর মনেহয়, (যা আসলেও অনেক কষ্টকর) তাহলে তার জন্য এ দুনিয়াতেই নিজ অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই আফসোস, অনুতাপ ও অনুশোচনার নামই 'তাওবা'। এজন্য হাদীছ শরীফে বলা হয়েছেঃ

النَدم توبة অর্থাৎ অনুশোচনাকেই তাওবা বলে।

(মুসনাদে আহমাদ ১ঃ৬২১, ইবনে মাজাহ ৩১৩)

তাওবার তিনটি উপকরণ

এখন প্রশ্ন হলো, এই অনুশোচনা কিভাবে পয়দা হবে। এর উত্তর এই হবে যে, অনুশোচনা পয়দা করার একমাত্র উপায় হলো, ইলম।

তাওবার প্রথম উপকরণ ঃ ইলম

কারণ যে পর্যন্ত মানুষ একথা জানতে না পারবে যে, আমি যা করেছি তা ভুল করেছি, ক্ষতির কাজ করেছি, সে সময় পর্যন্ত তার কৃতকর্মের প্রতি অনুতাপ ও অনুশোচনা হবে না। যে ব্যক্তি একথাই জানে না যে, আমি যা পান করেছি তা বিষ, সে কিভাবে বিচলিত হবে? সে বিচলিত তখনই হবে, যখন জানতে পারবে যে, আমি বিষ পান করেছি। এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক জিনিস।

অদ্রুপভাবে মানুষ যতক্ষণ না একথা জানতে পারবে যে, আমি যে কাজ করেছি তা পাপ, অবৈধ এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত, সে সময় পর্যন্ত তার ঐ কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হবে না। সুতরাং অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন পয়দা করার প্রথম পথ হলো, গোনাহকে যাতে গোনাহ্ হিসেবে চেনা যায়, তার জন্য পর্যাপ্ত ইলম হাসিল করা। এজন্য শুধু শাব্দিক বা প্রচলিত ইলম যথেষ্ট নয়। বরং এমন ইলম হাসিল করতে হবে, যা অন্তরে আখিরাতের ফিকির, আল্লাহর ভয় এবং গোনাহের প্রতি আগ্রহের চেয়ে ঘৃণা বেশী সৃষ্টি করে।

এজন্যই কুরআনে কারীমে আল্লাহ্র ভয়কে ইলমের চিহ্ন বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে উলামায়ে কেরামই তাঁকে ভয় করেন।
(সূরা ফাতির ২৮)

যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ফিকির এবং গোনাহের ক্ষতির ইলম ও ইয়াকীন নেই, সে আলেম নয় বরং চরম পর্যায়ের মূর্খ। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

جان جمله علمها این است واین

كه بدانی من کیم در یوم دین

অর্থাৎ, সকল ইলমের সারাংশ এই কথা অনুধাবন করা যে, হাশরের দিন আমার অবস্থা কেমন হবে?

যে সময় পর্যন্ত গোনাহ সম্পর্কে এই একীনী ইলম হাসিল না হবে যে, গোনাহ বাহ্যিকভাবে যতই সৌন্দর্য মন্ডিত এবং আকর্ষণীয় হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে গোনাহ হলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না। আর ঐ ইলম ব্যতীত তাওবার হাকীকত সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে না।

এই বিশেষ ইলম অর্জনের তরীকা এই যে, কুরআন ও হাদীছ নিয়ে গবেষণা করে গোনাহের ভয়াবহতা এবং এর কারণে যে শাস্তি হবে, একথা সর্বদা মস্তিষ্কে হাযির রাখা। সাথে সাথে গোনাহের ধ্বংসাত্মক পরিণতির ব্যাপারে مراقبه (ধ্যান) করে তা ভালভাবে হৃদয়ে বসিয়ে নেওয়া।

শাইখ ইবনে হাজর হায়ছামী (রহঃ) একটি স্বতন্ত্র পুস্তকে গোনাহের বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন। এতে গোনাহে কবিরা তিনশতটি বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফেয যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম (রহঃ) এবং হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ)ও কিতাব রচনা করেছেন। হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)ও স্বীয় রচনাবলীতে বিশেষ করে جزاء الاعمال (সুখ-দুঃখ কেন) নামক কিতাবে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে লিখেছেন। কাজেই এ সম্পর্কিত ইলম হাসিলের জন্য ঐ সকল কিতাব পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী।

তাওবার দ্বিতীয় উপকরণঃ অনুশোচনা

উপরোক্ত ইলম হাসিল করার পর তাওবার জন্য দ্বিতীয় উপকরণ হলো, অনুশোচনা। কারণ যখন কোন ব্যক্তি কোন গোনাহের কাজ সম্পর্কে একীনীভাবে জানতে পারবে যে, এটা একটা ধ্বংসাত্মক কাজ, তখন যদি সে অতীতে এ কাজ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে।

তাওবার তৃতীয় উপকরণঃ ক্ষতিপূরণ

এরপর তাওবার তৃতীয় উপকরণ হলো, 'ক্ষতিপূরণ'। এজন্য দু'টি কাজ করা আবশ্যক। (১) ভবিষ্যতে কোন গোনাহ্র কাজ না করার

জন্য মজবুত শপথ গ্রহণ। (২) অতীতে যে গোনাহ্ হয়েছে, যদি তা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে যথাসম্ভব সে হক আদায় করে দেওয়া। যেমন, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলো, এটা ফিরিয়ে দেওয়া। অথবা কাউকে হাত বা যবান দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকলে, তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদি।

আর যদি অতীতের গোনাহের সম্পর্ক আল্লাহপাকের হকের সাথে হয়, তাহলে যে সকল গোনাহের ক্ষতিপূরণ কাজা অথবা কাফফারা দ্বারা করা সম্ভব। সেগুলো সেভাবেই ক্ষতিপূরণ করা। যেমন, নামায অথবা রোযা ছুটে গিয়ে থাকলে তার কাজা করা। আর যদি কসম করে তা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তাহলে তার কাফফারা আদায় করা।

আর যদি গোনাহ্ এমন হয় যে, কাজা বা কাফফারার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়, তাহলে আল্লাহ্পাকের নিকট অত্যন্ত বিনয় ও অসহায়তা প্রকাশ করে ইস্তিগফার করতে হবে।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর দরবারে এ সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হতো। তিনি তাওবার সময় অতীতের গোনাহের ক্ষতিপূরণের সকল সম্ভাব্য দিক কাজে লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন এবং উৎসাহিত করতেন।

যদি উপরোক্ত নিয়মে তাওবা করা হয় তাহলে, হযরত থানভী (রহঃ) এর ভাষায় 'একটি লোক সামান্য সময়ের মধ্যেই আল্লাহপাকের কামেল ওলী হতে পারে। কারণ হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেনঃ

التائب من الذنب كمن لاذنب له

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির মতো, যে কোন গোনাহ করেনি। (ইবনে মাজাহ শরীফ ৩১৩)

তাওবার এই দরজা প্রতিটি মানুষের জন্য ঐ সময় পর্যন্ত খোলা থাকে, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর লক্ষণ শুরু হয়ে যায়। মৃত্যুর লক্ষণ আরম্ভ হওয়ার পর তার তাওবা কবুল হয় না।

আত্মশুদ্ধির পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ ধৈর্য

মাকামে সবর বা ধৈর্য ও তার প্রকারভেদ

আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাওবার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জাহের ও বাতেন (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ) যিন্দেগীকে সংশোধন করার জন্য ফিকির করবে। এর অর্থ এই যে, আল্লাহপাক যে সকল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে এবং যে সকল জিনিস নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকবে। জাহেরী যিন্দেগী (বা দৈহিক জীবনে) যে সকল জিনিস করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে শরী'অতের পরিভাষায় مامورات (বা নির্দেশাবলী) বলা হয়। যেমন, নামায, রোযা ইত্যাদি। আর যে সকল জিনিস করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকে منهيات (বা নিষিদ্ধ বিষয়াবলী) বলা হয়। যেমন, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি। مامورات এবং منهيات ইলমে ফিকাহ্‌র আলোচ্য বিষয়। কাজেই এর আলোচনা এখানে করা হবে না।

শারীরিক বা দৈহিক জীবনের মত আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু আমল এমন আছে যেগুলো আমাদেরকে করতে বলা হয়েছে। এসকল জিনিসকে তাছাওউফের পরিভাষায় فضائل বলা হয়। আর কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সে সকল বিষয়কে তাছাওউফের পরিভাষায় رذائل বলে। এখানে প্রথমে ফাযায়েল বা গুণাবলীর আলোচনা করা হবে, অতঃপর رذائل (দোষসমূহ) এর আলোচনা করা হবে।

এখানে আরেকটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, যখন কেউ فضائل এর মধ্য হতে কোন একটি ফযীলতের উপর এমনভাবে অভ্যস্থ হয় যে, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন এ অবস্থাটাকে তাছাওউফের পরিভাষায় "مقام" (বা পজিশন) বলে। কাজেই আমরা যখন বলবো যে,

অমুক ব্যক্তি مقام صبر (ধৈর্যের মাকাম) হাসিল করেছে, তখন তার অর্থ হবে যে, সে ধৈর্য নামক আধ্যাত্মিক আমলে (যা ফাযায়েলের অন্তর্ভুক্ত) খুব অভ্যস্ত হয়ে এটাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেছে। আজকের মাহফিলে مقام صبر সম্পর্কে কিছু জরুরী কথা আলোচনা করা হবে।

(صبر) সবর এর শাব্দিক অর্থ হলো, বাধা দেওয়া। আর ইসলামী পরিভাষায় সবর বলা হয়, নিজে নিজেকে নাজায়েয খেয়াল-খুশি থেকে বিরত রাখা।

এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কুরআনে কারীম এবং ইসলামী পরিভাষায় সবর শব্দটির অর্থ কেবল এ নয় যে, কোন দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ না করা [যেমন– সাধারণ আলোচনায় সবর (صبر) শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়] বরং তার ইসলামী পারিভাষিক অর্থের গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং ব্যাপক। এ অর্থে দ্বীনের প্রায় সকল শাখা সবরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে مقام صبر হাসিল করার জন্য যেরূপ তাকিদ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ অন্য কোন বিষয়ে এরূপ তাকীদ করা হয় নাই। সাথে সাথে صبر এর বিনিময় এবং ছওয়াবও এত বেশী বলা হয়েছে, যা অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। সুতরাং কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে সত্য এবং ধৈর্যের উপদেশ দাও।

(সূরা আসর ২–৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে।

(সূরা যুমার ১০)

ধৈর্যের উপরোক্ত গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন।

এটাতো সকলেই জানে যে, আল্লাহ্পাক মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ের উপাদান রেখেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

অর্থাৎ, আল্লাহপাক মানুষের হৃদয়কে গোনাহ এবং তাকওয়া উভয় সম্পর্কে অবগত করেছেন। (সূরা আশ্ শামছ ৮)

আর দুনিয়াতে আল্লাহপাক মানুষকে যে পরীক্ষা করেন, এর উদ্দেশ্যও এটাই যে, মানুষ মন্দ (পাপ) জিনিসকে ত্যাগ করে উত্তম (ছওয়াব) জিনিস অবলম্বন করবে। এ উদ্দেশ্যে মানুষের অভ্যন্তরস্ত ভাল উপাদানকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু উপকরণ নির্ধারণ করেছেন। সাথে সাথে মন্দ উপাদানকে শক্তিশালী করার জন্যও কিছু উপকরণ আছে।

মানুষকে ভাল জিনিসের (ছওয়াবের কাজের) প্রতি উৎসাহিত করার জন্য একটি শক্তি মানুষের অন্তরেই রাখা হয়েছে। যাকে نفس لوامه বলা হয় এবং সাধারণের পরিভাষায় এটাকে ضمير (বা বিবেক) বলে। কোন মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন একটি অদৃশ্য শক্তি তাকে সেই পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এটাই نفس لوامه যাকে আমরা বিবেক বলে আখ্যায়িত করে থাকি। এছাড়া আরো কিছু বহির্গত শক্তি এমন আছে, যা মানুষকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বহির্গত শক্তি হলো, ফেরেশতা। ফেরেশতা আল্লাহ্পাকের আনুগত্যশীল মাখলুক। এদের মধ্যে খারাপ কাজের কোন উপাদানই সৃষ্টি করা হয়নি।

পক্ষান্তরে দু'টি শক্তি এমন আছে, যা মানুষকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। তার মধ্যে একটি মানুষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে, যাকে نفس اماره বলা হয়। এটাই নফসানী খাহেশাত তথা প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি বা কামনা-বাসনার এমন উৎসস্থল, যা নেক কাজে ফাঁকি দেওয়ার এবং গোনাহের কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার জযবা পয়দা করে থাকে। আর পাপের প্রতি উৎসাহিত করার দ্বিতীয় শক্তি হলো। শয়তান

সে তার জীবনের উদ্দেশ্যই বানিয়েছে মানুষকে নেক কাজ থেকে দূরে রেখে গোনাহের কাজে লিপ্ত করে দেওয়াকে।

এই দুই ধরনের শক্তির টানাটানির মধ্যেই মানুষের জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য জরুরী হলো, মানুষ গোনাহের চাহিদার উপর নেক কাজের আগ্রহকে প্রাধান্য দিবে, বিজয়ী করবে। এটাকেই শরী'অতের পরিভাষায় صبر বা ধৈর্য বলে।

কেবলমাত্র মৌখিক জমা-খরচ দ্বারা ধৈর্যের এই (সুউচ্চ) مقام হাসিল করা যাবে না। এজন্য কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। সূফিয়ায়ে কেরাম অধিকাংশ মুজাহাদা (সাধনা)কে নির্দিষ্ট করেছেন এই ধৈর্যের মাকাম অর্জন করার জন্যই। অনেক বুযুর্গানেদ্বীন সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা অনেক বৈধ জিনিসও ত্যাগ করেছিলেন। এটা এজন্য নয় যে, তারা এ সকল বৈধ জিনিসকে হারাম মনে করতেন। বরং প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা নফসানী খাহেশাতকে (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনা তথা রিপুকে) নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতেন।

প্রথম দিকে মানুষের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়। কিন্তু একবার যদি কষ্ট করে এই তিক্ত ঔষধ খেয়ে নেয়, তাহলে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এ কাজ আল্লাহপাক তার জন্য সহজ করে দেন। এভাবে তার নফস نفس مطمئنه (প্রশান্ত হৃদয়) হয়ে যায়। অর্থাৎ তার নফসের উত্তম কাজের চাহিদা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, পাপ ও খারাপ কাজের চাহিদা তার নিকট একেবারে দুর্বল এবং মৃতপ্রায় হয়ে যায়। এ কথাটিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেনঃ

من يتصبر يصبره الله

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধৈর্যের মাকাম পর্যন্ত পৌছতে চায়, আল্লাহপাক তাকে صبر এর মাকাম দান করেন।

(বুখারী শরীফ ১ঃ১৯৮, মুসলিম শরীফ ১ঃ৩৩৭)

আর যে ব্যক্তি এই মহান নিয়ামত লাভ করে, তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

ما اعطى احد عطاء خيرا و اوسع من الصبر

অর্থাৎ, ধৈর্যের চেয়ে উত্তম এবং প্রশস্ত কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। (সহীহ বুখারী ১ঃ১৯৮, তিরমিযী ২ঃ২২)

ধৈর্যের এই (উচ্চ) মাকাম হাসিল করার আসল তরীকা হলো, সবর বা ধৈর্যের এই মাকাম যে সকল বুযুর্গদের নসীব হয়েছে, তাদের সোহবত বা সংসর্গ অবলম্বন করা। অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, পরিবেশ এবং নেক সোহবতের চেয়ে বড় শিক্ষক মানুষের জন্য আর কিছুই নেই। মানুষ যদি ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এবং পরিবেশে থাকে, তাহলে সেও ধীরে ধীরে ধৈর্যশীল হয়ে যাবে।

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সবরের (বা ধৈর্যের) মাকাম হাসিল করার পদ্ধতি হলো, যখন অন্তরে কোন পাপের খেয়াল আসবে, তখনই পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে এই গোনাহর প্রতি যে সতর্কবাণী ও মারাত্মক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কল্পনা করবে এবং সাথে সাথে স্বীয় মৃত্যু, পরিণতি ও কবরের একাকিত্ব ও নির্জনতার কথা স্মরণ করবে। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর চিন্তার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেনঃ

اكثروا ذكر ها اذم اللذات الموت

অর্থ, সকল স্বাদ বিনাশকারী অর্থাৎ মউতকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

(তিরমিযী ২ঃ৭৫, নাসায়ী ১ঃ২০২)

যে সকল লোককে আল্লাহপাক ধৈর্যের নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন এবং যাদের নেক কাজ করার শক্তি পাপ কাজের শক্তির চেয়ে প্রবল, তাদেরও কোন সময় নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। হযরত থানভী (রহঃ) স্বীয় খলীফাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতেন যে, তারা যেন কখনো নিজের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে গাফেল হয়ে না যান।

সাপ ও কাঠুরিয়া

হযরত থানভী (রহঃ) একদিন স্বীয় খলীফাদের উদ্দেশ্যে আলোচনাকালে মাওলানা রুমীর (রহঃ) মছনবী শরীফের একটি কাহিনী বর্ণনা করেন। সে কাহিনীটি এই যে, এক কাঠুরিয়া প্রতিদিন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে অন্ধকারের মধ্যেই বনে চলে যেতো এবং সন্ধ্যার সময় কাঠ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসতো। একদিন কাঠের সাথে শীতে কাবু একটি সাপও বোঝায় বাঁধা হয়ে গেলো। শীতে কাবু হওয়ার দরুণ রাস্তায় ঐ সাপ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিলো, যার ফলে সে রাস্তায় কাঠুরিয়ার কোন ক্ষতি করতে পারলো না। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছে যখন সে কিছুটা গরম অনুভব করলো তখনই ফোঁস ফোঁস করতে শুরু করলো, এবং কাঠুরিয়ার জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকী হয়ে দেখা দিলো।

মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন, نفس امارہ এর দৃষ্টান্তও ঠিক ঐ শীতে কাবু হয়ে যাওয়া সাপের ন্যায়, যা সাময়িকভাবে দুর্বলতো হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেনি।

نفس اژدہا است اوکے مردہ است

از غم بے آلتی افسردہ است

অর্থাৎ, নফ্‌স (কু-প্রবৃত্তি) বিষধর সাপতুল্য, সে মৃত নয়, বরং সহায়-সম্বলহীন অসহায়ত্বের দরুন দুর্বল মাত্র।

এজন্য উহা থেকে অমনোযোগী এবং নিশ্চিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ কাহিনী বর্ণনা করে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, একথা শুধু আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি না, বরং আপনাদের সাথে সাথে আমার নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করেও বলছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এ কথার উপর আমলও করে থাকি। একথা বলে তিনি স্বীয় ডেস্ক খুলে কিছু স্লীপ বের করে দেখালেন, সেগুলোতে বিভিন্ন হেদায়েত লিখা ছিলো। তিনি বললেনঃ আমি যে সকল ব্যাপারে নিজের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করি, এ সকল স্লীপে তার চিকিৎসা লেখা আছে।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি صبر এর এই مقام কে হাসিল করার কোন চেষ্টা না করে তাহলে, নফসানী খাহেশাত (প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা) তাকে পরাজিত করবে এবং সে নফসের হাতে অসহায় হয়ে থাকবে। এটা জানা কথা যে, একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

হাদীছ শরীফে আছে যে, মানুষ যখন কোন গোনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। মানুষ যদি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এবং বার বার গোনাহ করতে থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে এই কালো দাগ পুরো অন্তরকে ঘিরে নেয়। আর যখন মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে গোনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে তার বিবেক এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, সে কোন গোনাহকে আর গোনাহই মনে করে না।

ইন্দ্রিয়ানুভবযোগ্য জিনিসে এর দৃষ্টান্ত হলো, যদি কোন পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়ে দাগ লেগে যায়, তাহলে সর্বক্ষণ তা চোখে বাঁধে এবং তা দূর করার চিন্তাও থাকে। কিন্তু যদি ঐ সাদা পরিচ্ছন্ন কাপড়েই অসংখ্য দাগ লেগে যায়, তাহলে তা আর তত বেশী চোখে বাঁধে না এবং তা দূর করার চিন্তাও করা হয় না। সুতরাং গোনাহের কারণে অন্তরে সৃষ্ট প্রথম দাগকে যদি তাওবা দ্বারা ধৌত করা না হয় এবং তাওবার পর صبر (ধৈর্য) এর মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে পূর্ণ অন্তঃকরণ কলুষিত হয়ে যায়। আর এই কলুষতাকেই হাদীছ শরীফে 'অন্তরের জং' (মরিচা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যে সকল লোককে আল্লাহপাক স্বীয় নফসের ইসলাহ (আত্মশুদ্ধি) এর চিন্তা এবং আখিরাতের ফিকির দান করেছেন, তাঁরা সর্বদা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যে, কোন সময় যেন নফস ধৈর্যহারা হয়ে গোনাহের কাজে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) এর নিকট ডাক যোগে একবার এমন একটি চিঠি আসলো, যার খামের উপরের টিকেটে সীল লাগানো হয়নি। হযরত থানভী (রহঃ) টিকেটগুলো ছিড়ে ফেলে বললেনঃ যদিও সরকার আমাদের নিকট হতে

অনেক টাকা না জায়েয পন্থায় আদায় করে নেয়, এ হিসেবে ফতোয়ার দৃষ্টিতে আমাদের জন্য জায়েয আছে, এভাবে যতটুকু সম্ভব উসূল করে নেওয়া। কিন্তু এ সকল উপায় আমি এজন্য অবলম্বন করি না যে, এভাবে আমাদের নফস ফাঁকি দেওয়ার মতো খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

মাকামে শোকর

شکر نعمت ھائے تو چندان کہ نعمت ھائے تو!

অর্থঃ আপনার নেয়ামত যত প্রচুর পরিমাণ, শোকরও করি ততধিক পরিমাণ।

صبر (তথা ধৈর্য) এর পর দ্বিতীয় যে মাকামটি অর্জন করা ফরয, তাকে 'মাকামে শোকর' বলা হয়। আপনি যদি কুরআনে কারীম পড়ে থাকেন, তাহলে এ ধরনের অসংখ্য আয়াত দেখে থাকবেন, যে সকল আয়াতে শোকর আদায় করাকে মানুষের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। আজকের মজলিসে সংক্ষিপ্তাকারে এ কথা বর্ণনা করা হবে যে, এ শোকরের অর্থ কি এবং শোকরের এই মাকাম কিভাবে অর্জন করা যাবে?

শোকরের হাকীকত এই যে, প্রকৃত দাতা– আল্লাহপাকের নেয়ামত সমূহের এভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা, যেন এর দ্বারা স্বীকৃতি প্রদানকারী বান্দার অন্তরে আল্লাহপাকের মুহাব্বত এবং তাঁর আনুগত্যের জযবা পয়দা হয়। মোটকথা শোকরের জন্য তিনটি আবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে।

(১) এ কথা মেনে নেওয়া এবং স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আমি যত নেয়ামতের অধিকারী হয়েছি, তার সবই আল্লাহপাকের পক্ষ হতে এবং এগুলো সবই তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেছেন।

(২) যেহেতু আল্লাহপাক আমার প্রতি তার দয়া ও করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করে রেখেছেন, সেহেতু সমগ্র জগতে আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়তম আর কেউ হতে পারবে না।

(৩) আল্লাহ প্রদত্ত অসীম নেয়ামতের স্বাভাবিক চাহিদা এই যে, আমি যেন আমার জীবনে তারই আনুগত্য করি। তাঁর পরিবর্তে অন্য

কারো আনুগত্য যেন না করি। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি যে সকল নেয়ামত আমাকে দান করেছেন, তা যেন শুধুমাত্র ঐ সকল কাজে খরচ করি, যা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টানুযায়ী হয়ে থাকে এবং ঐ সকল কাজে খরচ করা থেকে বিরত থাকি, যা তাঁর সন্তুষ্টির খেলাফ হয়।

যখন শোকরের উপরোক্ত তিনটি উপাদান কোন ব্যক্তির মধ্যে একত্রে পাওয়া যাবে, তখন তাছাওউফের পরিভাষায় এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে শোকরের মাকাম হাসিল করেছে।

শোকরের মাকাম হাসিল করার জন্য ঐ তিন উপাদানের মধ্যে প্রথম উপাদানটি হলো মূল। কারণ কারো অন্তরে যদি এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহপাকের পক্ষ হতে কত অসংখ্য নেয়ামত সর্বক্ষণ আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে! এ চিন্তার আবশ্যম্ভাবী ফল এই হবে যে, আল্লাহপাকের প্রতি অগাধ মুহাব্বত এবং তাঁর আনুগত্যের জযবা নিজে নিজেই পয়দা হবে। কাজেই যদি কখনো মুহাব্বত এবং আনুগত্যের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহপাকের নেয়ামতসমূহের যথাযথ স্বীকৃতির ভাব এখনো অন্তরে পয়দা হয় নাই।

মনে করুন, অপরিচিত এক ব্যক্তি সকল বিপদে আপনার সাহায্য করে থাকে। যেমন, যখনই আপনার টাকা-পয়সার খুব বেশী প্রয়োজন হয়, তখনই সে নিজ থেকে কোন না কোনভাবে টাকা-পয়সা আপনার নিকট পৌঁছে দেয়। আবার যদি কোন সময় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সে খুবই কার্যকর ঔষধ আপনাকে জোগাড় করে দেয়। আবার যখন আপনি বেকার হয়ে পড়েন, তখন তিনিই আপনাকে উত্তম রুজির ব্যবস্থা করে দেয়। মোটকথা যখনই আপনি দুঃখিত হোন এবং অসহায় বোধ করেন, তখনই সে অজানা পদ্ধতিতে আপনার সাহায্য করে থাকে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আপনি যত কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হোন না কেন, ঐ ব্যক্তির ভালবাসা আপনার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যাবে। কোন সময় যদি এই ব্যক্তি আপনাকে কোন কাজ করতে বলে, তাহলে তা পালন করতে আপনি আনন্দ এবং গৌরব অনুভব করবেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা বুঝা গেলো যে, যদি দাতার দয়ার কথা সঠিক ও যথাযথভাবে অনুধাবন করা যায়, তাহলে তাঁর প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং তাঁর হুকুম মানার স্পৃহা নিজে নিজেই অন্তরে পয়দা হয়। সুতরাং 'শোকরের মাকাম' হাসিল করার জন্য প্রথম কাজ এই যে, আল্লাহপাকের অনুগ্রহসমূহের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা এবং এ চিন্তা সর্বদা মস্তিষ্কে জাগ্রত রাখার মনোভাব সৃষ্টি করা।

বিশ্বাসগতভাবে প্রতিটি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এ কথা মানে যে, সকল নেয়ামত আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকেই আসে। কিন্তু 'শোকরের মাকাম' হাসিল করার জন্য জরুরী হলো, স্বীয় চিন্তা-চেতনায় এই ধারণাটিকে এমন বদ্ধমূল করে নেওয়া যে, সর্বক্ষণ যেন এই বাস্তব ধারণাটি সামনে দন্ডায়মান মনে হয়। সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বলা যেতে পারে যে, এই হাকীকতকে এমনভাবে অন্তরে জাগ্রত রাখবে এবং এমন শক্তিশালী করে নিবে যে, শোকরগুজার ব্যক্তির এ বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য যেন কোন প্রকার দলীলের প্রয়োজন না হয়। বরং সে উহা প্রত্যক্ষ করবে। এমনকি দুঃখ-বেদনার সময়ও সে ঐ শত-সহস্র নেয়ামতের কথা ভুলবে না, যা ঐ বিপদ-মুহূর্তেও তার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। 'শোকরের মাকাম' হাসিল করার পূর্বে মানুষের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি খুবই প্রবল এবং আল্লাহপাকের দেওয়া নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সে শত-সহস্র নেয়ামত এবং আরাম-আয়েশের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও যদি সামান্য কষ্ট পায়, তাহলে সকল নেয়ামতের কথা ভুলে যায় এবং সকল মনোযোগের কেন্দ্র-বিন্দু ঐ কষ্টকে বানিয়ে নেয় এবং এই দুঃখ নিয়েই বসে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 'শোকরের মাকাম' হাসিল করেছে, সে বিভিন্ন প্রকার পেরেশানীতে আবদ্ধ থাকার সময়ও তার প্রতি আল্লাহপাকের নেয়ামতের পাল্লাকে ভারী দেখতে পায়। এ কারণে বিপদের মুহূর্তেও তার মুখ থেকে অভিযোগ, আপত্তি ও হা-হুতাশের পরিবর্তে শোকরিয়ার বাক্যই উচ্চারিত হয়।

মিয়া সাহেবের শোকর

দারুল উলূম দেওবন্দের উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গদের মধ্যে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুছাইন সাহেব (রহঃ), যিনি 'মিয়া সাহেব'

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তার ঘটনা। তিনি আমার অন্যতম উস্তায এবং মুরুব্বী ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার তিনি মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি তখন জ্বরের প্রকোপে বেহুশের ন্যায় পড়েছিলেন। জ্বরের তীব্রতায় তিনি বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। একবার তাঁর সামান্য হুশ হলো, আমি তখন সালাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন? তিনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! অনেক ভাল! আল্লাহপাকের শোকর, আমার অন্তঃকরণ সুস্থ আছে। কলিজার মধ্যে কোন প্রকার ব্যাথা নেই। বক্ষেও কোন কষ্ট নেই। সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ঠিক মতো কাজ করছে। তবে (সামান্য) জ্বর আছে।

তাঁর এই দৃঢ়তা এবং এই পরিস্থিতিতেও শোকর আদায় করা, এটা শোকরের মাকামেরই ফল। কারণ তিনি জ্বরের প্রচন্ড প্রকোপে বেহুশ প্রায় হয়েও এ হাকীকতকে ভুলেননি যে, কষ্টতো একটি, অথচ অগণিত নেয়ামত এ কষ্টের মুহূর্তেও ভোগ করছি। নিঃসন্দেহে হাকীকত এটাই, যা মিয়া সাহেব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জ্বর নিশ্চয় একটি কষ্টদায়ক রোগ। কিন্তু তার সাথে সাথে কত নেয়ামত উপভোগ করছি। দেখার জন্য চোখ নামক নেয়ামত, কথা বলার জন্য যবান নামক নেয়ামত, শোনার জন্য কান নামক নেয়ামত, স্পর্শ করা ও ধরার জন্য হাত নামক নেয়ামত, চিকিৎসার জন্য হাকীম, ডাক্তার, রোগ-শোকে দেখাশোনা ও সেবা-যত্নের জন্য আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি নেয়ামত উপভোগ করছি। পক্ষান্তরে কষ্টতো কেবল জ্বরের, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, বক্ষ ও ফুসফুস সহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিশেষ বিশেষ রোগ থেকে মুক্ত। হাকীকত যদিও এটাই, কিন্তু সাধারণভাবে প্রায় সকল মানুষ এ ধরনের অসুস্থ অবস্থায় সকল নেয়ামত থেকে গাফেল হয়ে কেবলমাত্র রোগ-যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টি রাখে। প্রকৃত অবস্থা কেবলমাত্র ঐ সকল লোকেরাই অনুধাবন করতে পারেন, যাদেরকে আল্লাহপাক 'মাকামে শোকর' নামক অমূল্য রত্ন দান করেছেন।

মাকামে শোকর অর্জনের উপায়

'মাকামে শোকর' এর এ মহান দৌলত কিভাবে অর্জিত হবে? ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'মাকামে শোকর' হাসিল করার পদ্ধতি হলো,

আল্লাহপাকের নেয়ামত সম্পর্কে অধিক পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা করা। তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'এহ্ইয়াউ উলূমিদ্ দ্বীনে' ঐ সকল নেয়ামতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ শোকরের মাকাম হাসিল করতে পারে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, নেয়ামতসমূহ দুই প্রকার। (১) ঐ সকল নেয়ামত যা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে লাভ করে থাকে। যেমন, অমুক ব্যক্তি অনেক বড় আলেম। অমুক ব্যক্তি সুন্দর একটি বাড়ীর মালিক। অমুক ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যশালী সন্তান লাভ হয়েছে। অমুকে সকলের প্রিয়পাত্র। উপরোক্ত নেয়ামতসমূহ ব্যক্তির সাথে খাছ। (২) এছাড়া কিছু নেয়ামত এমন আছে, যা ব্যাপকভাবে সকল সময় সকল মানুষ লাভ করে থাকে। যেমন, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আগুন, পানি, বাতাস, পাহাড়, জঙ্গল, মাটি, মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, চক্ষু, কর্ণ, নাক, হাত, পা ইত্যাদি। মানুষ যদি এ সকল নেয়ামত ও এর হেকমত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে এটা সম্ভবই নয় যে, সে 'শোকরের মাকাম' হাসিল করতে পারবে না। কিন্তু যেহেতু এ সকল নেয়ামত না চাইতেই আল্লাহপাক দান করেছেন এবং এ সকল নেয়ামত হাসিল করার জন্য কোন প্রকার পয়সা খরচ হয়নি, পরিশ্রম করতে হয়নি, এজন্য মানুষ হয়তো এগুলোকে নেয়ামতই মনে করে না অথবা নেয়ামত মনে করলেও এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করে, সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলো অতিক্রম করে যায়। অথচ মানুষের এভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন ছিলো যে, যদি কখনো ঐ সকল নেয়ামত হতে কোন একটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এক কোটি দুই কোটি নয়, সমগ্র দুনিয়ার সকল সম্পদ ব্যয় করেও কি তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে? না সম্ভব হবে না, পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইশারা করা হয়েছেঃ

إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ

অর্থাৎ, আল্লাহপাক যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর স্থায়ীভাবে রাত্রিকে চাপিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন মাবুদ আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করবেন?

(সূরা আল কাসাস ৭১)

এরূপভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ

অর্থাৎ, আল্লাহপাক যদি স্থায়ীভাবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে চাপিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন মাবুদ আর কে আছে, যে তোমাদের এমন রাত এনে দিতে পারবে, যে রাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করবে? (সূরা আল কাসাস ৭২)

মোটকথা! মানুষের উচিত প্রথমতঃ ঐ সকল নেয়ামত যা ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট এবং যেগুলো হতে অনেক মানুষই বঞ্চিত, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। অতঃপর ঐ সকল নেয়ামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, যা প্রায় সকল মানুষই সকল মুহূর্তে লাভ করে থাকে। কারণ এ সকল নেয়ামত এমন যে, সারা দুনিয়ার সকল বুদ্ধিজীবি, সকল বিজ্ঞজন, সকল বৈজ্ঞানিক মিলেও যদি চেষ্টা করে, তাহলে তা সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি এগুলোর মধ্য হতে যদি কোনটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তা ফিরিয়েও আনতে পারবে না।

এ চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা الحكمة فى مخلوقات الله (সৃষ্টি রহস্য) খুবই সহায়ক। এর উর্দূ অনুবাদও এ নামে প্রকাশিত হয়েছে (বাংলায়ও সৃষ্টি রহস্য নামে এর অনুবাদ হয়েছে)। শোকরের মাকাম হাসিল করার জন্য এবং আল্লাহপাকের নেয়ামতসমূহের চিন্তা অন্তরে জাগ্রত রাখার জন্য এটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী হবে।

মাকামে যুহ্দ (দুনিয়া বিমুখতা)

چیست دنیا از خدا غافل شدن

অর্থাৎ, আল্লাহপাক হতে গাফেল হওয়ার নামই দুনিয়া।

'যুহ্দ' এর শাব্দিক অর্থ হলো, নিজের প্রিয় কোন জিনিসকে অন্য উত্তম জিনিসের তরে ত্যাগ করা। ইসলামী পরিভাষায় 'যুহ্দ' বলা হয় আখিরাতের (কল্যাণের) জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কেবলমাত্র দুনিয়া ত্যাগ করার নাম 'যুহ্দ' নয়। এজন্য কোন ব্যক্তি যদি নির্বোধ হওয়ার দরুণ দুনিয়া ত্যাগ করে, তাহলে এটাকে 'যুহ্দ' বলা যাবে না।

আখেরাতের কল্যাণের জন্য যে ধরনের দুনিয়া ত্যাগী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে, সেটা বুঝতেও অনেকে ভুল করে থাকে। অনেকে 'যুহ্দ' আর বৈরাগ্যকে এক মনে করে থাকে। তারা মনে করে যে, পানাহার করা, ব্যবসা করা, জীবিকার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা 'যুহ্দ' এর পরিপন্থী। অথচ এ ধরনের দুনিয়া ত্যাগী হওয়া কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট হুকুমের পরিপন্থী।

এ কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে যে, একটি জিনিষ হলো, দুনিয়ার অতি প্রয়োজনীয় কাজ-কারবার, যেগুলো বাদ দিয়ে মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব এবং যেগুলো অর্জন করা মানুষের স্বভাবের মধ্যে দাখেল; যেমন, প্রয়োজন অনুসারে পানাহার করা, জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করা, এ ধরনের জিনিসকে 'হুকূকে নফ্স' বলা হয়। শরী'অত মানুষের জন্য এ সকল হক আদায় করাকে আবশ্যকীয় করেছে। এ সকল হক ত্যাগ করাকে বৈরাগ্য বলে। কুরআনেকারীমে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

অর্থাৎ, ইসলাম (কর্তৃক নির্ধারিত) ফরীযার পর অন্য আরেকটি ফরীযা হলো জীবিকা অন্বেষণ করা। (আস্ সুনানুল কুবরা ৬ঃ১২৮ ও বায়হাকী)

এজন্যই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) স্বীয় মুরীদদেরকে নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বিশেষ তাকীদ করতেন। কেননা এটা নফসের হকের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কোন কাজই করতে পারে না।

অপর জিনিসটি হলো, 'হুযূযে নফস' অর্থাৎ, প্রবৃত্তির ঐ সকল কামনা-বাসনা, যার উপর মানুষের জীবনধারণ নির্ভরশীল নয় এবং যা হাসিল করা মানুষের স্বভাবের মধ্যে দাখেল নয়। মানুষ এ সকল জিনিস জীবনধারণের প্রয়োজনে নয়, বরং স্বীয় প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি পূরণ ও চাহিদা মিটানোর জন্য অবলম্বন করে থাকে। এ ধরনের কামনা-বাসনা ত্যাগ করাকে 'যুহ্দ' বলে। এটাই ইসলামের পছন্দ ও উদ্দেশ্য। কুরআন-হাদীছ, ফিকাহ এবং সূফীয়ায়ে কেরামের বাণীতে দুনিয়া ত্যাগী হওয়া বলতে এ যুহ্দকেই বুঝানো হয়েছে, বৈরাগ্যকে নয়।

'যুহ্দ' এর তিনটি স্তর

সূফীয়ায়ে কেরাম বলেছেনঃ যুহ্দের তিনটি স্তর।

(১) সর্বোচ্চ স্তরঃ এই যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি অন্তরে এমন বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া যে, যদি না চাইতেও কেউ কোন কিছু দেয়, তাহলে তাও ভাল মনে হয় না। কিন্তু এ ঘৃণা সত্ত্বেও তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে এবং মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়) 'যুহ্দ' এর এই সর্বোচ্চ স্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলো। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة

ثم راح وترکها

অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমার দৃষ্টান্ততো ঐ ঘোড় সওয়ারের মতো যে সামান্য সময়ের জন্য কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, কিছুক্ষণ পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তা ছেড়ে চলে যায়।

(তিরমিযী ২ঃ৬৩)

এ কারণেই খানা-পিনার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিলো যে, তিনি অত্যন্ত কম খেতেন। শামায়েলে তিরমিযীর একাধিক বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট ভরে খানা খাননি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) ইরশাদ করেন, অনেক সময় আমরা মাসের পর মাস শুধুমাত্র খেজুর এবং পানি খেয়ে কাটিয়েছি।

(বুখারী শরীফ ২ঃ৯৫৫, মুসলিম শরীফ ২ঃ৪১০)

(২) দ্বিতীয় স্তরঃ 'যুহ্দ' এর দ্বিতীয় স্তর এই যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি প্রবল ঘৃণাবোধও থাকবে না এবং বিশেষ আকর্ষণও থাকবে না। মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত ধন-সম্পদ হস্তগত হলে আল্লাহপাকের শোকরিয়া আদায় করে তা ব্যবহার করে এবং কোন কিছু না পেলেও তেমন কষ্ট অনুভব করে না, আফসোসও করে না।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) এর কাহিনী

একবার মক্কা শরীফ থেকে তার সমস্ত মালপত্র চুরি হয়ে গেলো। চোরেরা তাঁর বাসা থেকে একেবারে পরিষ্কার করে সকল জিনিস-পত্র নিয়ে গেলো। একথা যখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) জানতে পারলেন, তখন একটুও মন খারাপ করলেন না। বরং এক বিশেষ অবস্থায় নিম্নোক্ত কবিতার পংক্তি পাঠ করলেনঃ

ماهیچ نه داریم وغم هیچ نه داریم

অর্থাৎ, আমার (ধন-সম্পত্তি) কিছুই নেই, কাজেই কোন কিছুর চিন্তাও নেই।

ঘটনাক্রমে মুরীদদের চেষ্টায় চুরি যাওয়া মাল উদ্ধার হলো এবং তিনি তা ফিরে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং তা ব্যবহার করলেন।

হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) সম্পর্কেও এ ধরনের ঘটনা বর্ণিত আছে।

(৩) 'যুহ্দ' এর তৃতীয় স্তরঃ এই যে, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আছে ঠিকই কিন্তু দুনিয়া কামানোর চিন্তা বেশী করে না। এ কারণেই দুনিয়ার মোহ তাকে আল্লাহপাকের স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারে

না। 'যুহ্‌দ' এর এ স্তরের অপর নাম قناعت (অল্পে তুষ্টি) এ সম্পর্কে আল্লামা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

چیست دنیا از خدا غافل شدن

نے قماش ونقرہ وفرزند وزن

অর্থাৎ, (কেবলমাত্র) স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ত্রী ও পুত্রের নাম দুনিয়া নয়, দুনিয়া হলো, মানুষের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি পরিপূর্ণভাবে এ সকল জিনিসে আবদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহপাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পদ তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে না পারে, তাহলে তার এই সম্পদকে দুনিয়া বলা হবে না। পক্ষান্তরে কারো নিকট যদি চারটি পয়সাই (অতি সামান্য সম্পদ) থাকে এবং এই চার পয়সার মধ্যে তার মন আটকে থাকে, তাহলে এটাকেই দুনিয়া বলা হবে এবং এটাই তিরস্কৃত।

এক বুযুর্গের কাহিনী

একজন বুযুর্গের কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এক ব্যক্তি তার বুযুর্গীর নাম-ডাক শুনে অত্যন্ত ভক্তি নিয়ে মুরীদ হওয়ার জন্য তার নিকট পৌছলো। কিন্তু সে দেখলো এ বুযুর্গের সময়ের একটি বিরাট অংশ তার ব্যবসায়িক কাজে ব্যয় হয়। এজন্য তার বুযুর্গী সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দিলো। সে ঐ বুযুর্গকে প্রশ্ন করলো, এত বিরাট কারবার 'যুহ্‌দ' এর পরিপন্থী নয় কি? ঐ বুযুর্গ সে সময় কোন উত্তর দিলেন না। পরবর্তীতে একদিন তিনি তার ঐ মুরীদকে নিয়ে বসতী থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। সেখানে পৌছে তিনি মুরীদকে বললেন, ভাই! হজ্জে যেতে ইচ্ছা হয়, মুরীদ একথা শুনে উত্তর দিলোঃ আমারও হজ্জে যেতে ইচ্ছে হয়, একথা শুনে বুযুর্গ বললেনঃ তাহলে চলো। একথা বলে তিনি মক্কা নগরীর দিকে চলতে শুরু করলেন। মুরীদ (এ অবস্থা দেখে) বললোঃ হযরত শহরে আমার একটি চাদর রেখে এসেছি, (আপনি একটু দেরী করুন) আমি সেটি নিয়ে আসছি। একথা শুনে বুযুর্গ বললেনঃ তোমারতো চাদরের চিন্তা হলো, কিন্তু এদিকে তুমি লক্ষ্যই করলে না যে, আমার কারবার কত বিস্তৃত, এ কথা শুনে মুরীদের হুশ হলো, সে বললোঃ হযরত ব্যাপারটি আমার বুঝে এসেছে।

যুহ্‌দের দৃষ্টান্ত

হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ) মছনবী শরীফে একটি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্তের মাধ্যমে 'যুহ্‌দ' এর ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের দৃষ্টান্ত হলো নৌকার মত। আর দুনিয়ার দৃষ্টান্ত পানির মতো। নৌকার জন্য পানি এত বেশী প্রয়োজন যে, পানি ব্যতীত নৌকা চলতেই পারে না এবং যতক্ষণ পানি নৌকার নীচে আশেপাশে থাকবে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য রহমত স্বরূপ। কিন্তু যদি এই পানি নৌকার ভেতরে এসে যায়, তাহলে এই পানিই নৌকা ডুবির (ধ্বংসের) কারণ হয়। ঠিক দুনিয়ার অবস্থাও এরকমই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া মানুষের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ তা মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ। কিন্তু যদি এই দুনিয়া মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তাহলে এই দুনিয়াই মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে। আল্লামা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

آب اند زیر کشتی پستی است

آب در کشتی هلاك کشتی است

অর্থাৎ, পানি নৌকার নীচে হলে তা রহমত। আর পানি নৌকার ভেতরে হলে তা তার ধ্বংসের কারণ হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই হিকমতপূর্ণ দৃষ্টান্ত দ্বারা মাওলানা রুমী (রহঃ) দুনিয়ার হাকীকত এমনভাবে উন্মোচণ করেছেন যে, এর উপর আর অতিরিক্ত কিছু হতে পারে না। মোটকথা, 'যুহ্‌দ' এর প্রাণশক্তি এই যে, মানুষের অন্তর আল্লাহ ব্যতীত সব জিনিস থেকে মুক্ত হবে, চাই সে স্ত্রী-পুত্রের মাঝেই হোক না কেন? সে পানাহারও করবে, আরাম এবং ফূর্তিও করবে, জীবিকার জন্য প্রচেষ্টাও চালাবে। কিন্তু এগুলোর মধ্য হতে কোনটির মুহাব্বত সে অন্তরে প্রবল হতে দিবে না। অন্তরকে সে আল্লাহপাকের স্মরণের জন্য মুক্ত রাখবে। কবি আকবর কত সুন্দর বলেছেনঃ

یہ کہاں کا فسانہ سود وزیاں + جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم + جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

অর্থাৎ, লাভ ক্ষতির কাহিনী বর্ণনায় কোন লাভ নেই
যা হারিয়েছি, হারিয়েছি, যা পেয়েছি, পেয়েছি
স্বীয় হৃদয়কে বলো, জীবনে সময় খুবই অল্প,
দাও হে খোদা তোমার স্মরণের তাওফীক দাও।

হযরত খাজা আজীজুল হাসান মাজযুব (রহঃ) বলেনঃ

دنیا مین ہون دنیا کا طلب گار نہین ہون
بازار سے گزار ہون خریدار نہین ہون

অর্থাৎ, দুনিয়াতে আছি দুনিয়াদারের ন্যায় কিন্তু দুনিয়ার চাহিদা নেই। বাজার অতিক্রম করলেও খরিদদার নই।

এ যুগে 'যুহ্দ' এর প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর হাসিল করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ ক্ষুধা ও দারিদ্র যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে বর্তমান অবস্থায় তা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণও হতে পারে। এজন্য মুহাক্কিক সূফীয়ায়ে কেরাম বলেছেন, এ যুগে 'যুহদ' এর তৃতীয় স্তর হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) স্বীয় মুরীদদেরকে বলতেন, তোমাদের সকলের পরিবর্তে ক্ষুধা ও দরিদ্রতার যাতনা আমি ভোগ করেছি। তোমাদের জন্য 'যুহ্দ' হলো– তোমরা হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করো এবং আল্লাহপাকের স্মরণ থেকে গাফেল হইও না।

মাকামে তাওহীদ

یکے دان، یکے خوان، یکے بین، یکے جو

অর্থঃ আল্লাহ্‌কে একক জানো, একক পড়ো, একক দর্শন করো, একক অনুসন্ধান করো।

যে সকল বাতেনী আমল মানুষের জিম্মায় আবশ্যকীয় করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো "তাওহীদ" বা একত্ববাদের স্বীকৃতি। 'তাওহীদ' এর একটি অর্থ– যা ইলমে আক্বাইদের কিতাবে পড়ানো হয়ে থাকে, যার অর্থ এই যে, আল্লাহপাককে এক বলে স্বীকার করা এবং তাঁর

সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। এটাকে আক্বীদাগত তাওহীদ বলা হয়। এর উপরই ঈমানের ভিত্তি। এই স্বীকৃতি ব্যতীত মানুষ মুসলমানই হতে পারে না। কিন্তু ইলমে তাছাওউফে 'তাওহীদ' বলতে আমলী তাওহীদকে বুঝানো হয়, যা আক্বীদাগত তাওহীদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। এর ব্যাখ্যা এই যে, আক্বীদাগত তাওহীদে যে বিশ্বাসটি আমলীভাবে হাসিল করা হয়েছিলো, সেই বাস্তব বিশ্বাসকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা। অর্থাৎ, সর্বক্ষণ এই হাকীকতটির প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, এ জগতে যা কিছু হচ্ছে, তা কেবল আল্লাহপাকের একক সত্ত্বা থেকে হচ্ছে। এই দুনিয়ায় যত ঘটনা ঘটে, তা সবই আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘটে। আল্লাহপাকের ইচ্ছা ব্যতীত একটি কণাও এদিক-সেদিক নড়াচড়া করতে পারে না। বিশ্বাসগতভাবে উপরোক্ত কথাগুলোকে সকল মুসলমানই জানে এবং মানে। কিন্তু সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সকল মুহূর্তে এ হাকীকতটি অন্তরে জাগ্রত থাকে না। এ কারণে যখন কোন বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে সুখ অথবা দুঃখ পৌঁছে, তখন সেই বাহ্যিক উপকরণকেই সবকিছুর কারণ মনে করা হয় এবং আনন্দ অথবা বেদনা উভয়ের সম্পর্ক ঐ উপকরণের দিকে করা হয়। কিন্তু আমলী তাওহীদের দাবী হলো, ঐ হাকীকতকে সর্বক্ষণ অন্তরে এভাবে জাগ্রত রাখা, যেন তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ কথাটিকে কোন বুযুর্গ এভাবে বলেছেনঃ

توحید خدا واحد دیدن بود ، نه واحد گفتن

অর্থাৎ, অন্তরে আল্লাহপাকের একত্ববাদের দর্শন ও স্বীকৃতিকে তাওহীদ বলে, কেবল মুখে একক বলাকে নয়।

মানুষ যখন জগতের সকল ঘটনার পিছে সর্বক্ষণ এক আল্লাহকে দেখে, তখন সে অন্য মানুষের দোস্তী ও দুশমনীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা সে ভাল মতোই জানে যে, সুখ অথবা দুঃখ যা কিছুই আসছে সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। বাহ্যিকভাবে যে লোকটিকে এর কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সে শুধুমাত্র এ ঘটনার মাধ্যম বৈ নয়।

از خدا دان خلاف دشمن ودوست

که دل هر دو در تصرف اوست

অর্থাৎ, শত্রুর শত্রুতা এবং বন্ধুর বন্ধুত্ব সবই আল্লাহর পক্ষ হতে

কেননা মানুষের অন্তর সর্বক্ষণ আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর রুচী বিরুদ্ধ, অপছন্দনীয় কোন কিছু ঘটতো, তখন তিনি অতিরিক্ত ক্রোধ প্রকাশের পরিবর্তে শুধু এতটুকু বলতেন যে,

ماشاء الله كان وما لم يشأ لايكون

অর্থাৎ, আল্লাহপাক যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। আর যা তিনি চাইবেন না, তা হবে না।

বাস্তব কথা এটাই যে, দুঃখ এবং বেদনার মুহূর্তে আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থা হতে পারে না।

অপূর্ব অভিযোগ

ইমাম গাযালী (রহঃ) একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ কথাটি বুঝিয়েছেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি তলোয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, 'তুই আমাকে হত্যা করেছিস! তলোয়ার বললোঃ 'আমি কে? আমার কি শক্তি আছে? আমাকেতো হাত ব্যবহার করেছে, কাজেই যদি অভিযোগ করতে হয়, তাহলে হাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করো।' একথা শুনে সে ব্যক্তি হাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। হাত বললো, 'আমার অপরাধ কি? আমিতো অনুভূতিহীন, সামর্থহীন ছিলাম। অন্তরের ইচ্ছাশক্তি এসে আমাকে একথা বলে জাগ্রত করেছে যে, এই কারণে লড়তে হবে। এর সাথে লড়াই করো।' তখন ঐ ব্যক্তি অন্তরের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। তখন ইচ্ছাশক্তি বললো, 'আমার কি দোষ! আমাকেতো অন্তঃকরণ এ কাজে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেছে।' ঐ ব্যক্তি যখন অন্তঃকরণের শরণাপন্ন হলো, তখন অন্তর বললোঃ আমার হাকীকত হলো এই যে, আমি অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন।

القلوب بين اصبعى الرحمن

(অর্থাৎ, মানুষের দিল আল্লাহপাকের দুই আংগুলের মাঝে (—অর্থাৎ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে) এভাবে সকল কাজের মূলেই মূল নিয়ন্ত্রণকর্তা একজনই হয়ে থাকেন, তিনি হলেন আল্লাহতা'আলা।

এটাই সেই বাস্তব কথা যেটা সর্বদা মস্তিষ্কে জাগ্রত রাখা 'আমলী তাওহীদের' উদ্দেশ্য। যখন কোন ব্যক্তি তাওহীদের এই মাকাম পূর্ণভাবে হাসিল করে, তখন তার অন্তরে কারো খোশামোদীর ভাবও সৃষ্টি হয় না এবং সে কারো পরোয়াও করে না। আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সে ভয়ও করে না। ধন-সম্পদের লোভ তাকে কোন কাজে উৎসাহিত করতে পারে না। তখন তার জানের ভয়ও থাকে না। এ কথাটিকে শেখ সাদী (রহঃ) এভাবে বলেছেনঃ

موحدا چه برپائے ریزی زرش

چه فولاد هندی نهی بر سرش

امید و هراسش نه باشد زکس

همین است بنیاد توحید وبس

অর্থাৎ, মুয়াহহিদের (তাওহীদ পন্থী) পদতলে
ধন-সম্পদ বর্ষিত হোক রাশি রাশি
কিংবা তাহার মস্তকে পরানো কলংকময় টুপি,
কোন মানব কিংবা সৃষ্টি তরে আশা তার হবে নাকো কভু
এটাই হলো তাওহীদের মূলমন্ত্র, যা ভুলবো নাকো কভু।

কেননা যে ব্যক্তি 'মাকামে তাওহীদ' হাসিল করেছে, সে শুধু এই বাস্তবতা অনুধাবনই করে না বরং সে খোলা চোখে দেখে যে, সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ মিলেও যদি আমার কোন উপকার করতে চায়, তাহলে আল্লাহপাকের ইচ্ছা ব্যতীত উপকার করতে পারবে না। আর সারা দুনিয়ার সকল মানুষ মিলেও যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চায়, তাহলে আল্লাহপাকের ইচ্ছা ব্যতীত তা দিতে পারবে না। কাজেই আমি কেন কাউকে ভয় করবো? কারো তোষামোদ কেন করবো? কোন লোভের শিকার কেন হব? সুতরাং সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয়ও করে না। কারো সামনে মাথাও নত করে না। কারো তোষামোদও করে না। কারো থেকে এমন কোন আশাও করে না, যা পূরণ না হলে সে কষ্ট পায়। সে তো কেবলমাত্র আল্লাহপাকের একক সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যস্ত থাকে। তার শ্লোগান এটাই যে,

یکے دان، یکے خوان، یکے بین، یکے جو

অর্থাৎ, আল্লাহকে একক জানো, একক মানো

একক দেখো, একক অনুসন্ধান করো।

এখন প্রশ্ন হলো, এই বিশেষ মাকাম কিভাবে অর্জন করা যাবে। আসল কথা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে প্রতিটি মুসলমানের তাওহীদের ইয়াকীনতো আছে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি যেহেতু বাহ্যিক উপায়-উপকরণে আবদ্ধ থাকে, এজন্য ঐ বিশ্বাসের উপর কিছু সংশয় চেপে থাকে। ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী এর দৃষ্টান্ত এই যে, একটি মৃত লাশের ব্যাপারে প্রতিটি লোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এটি (এখন) একটি জড় পদার্থ। এর মধ্যে কোন বোধশক্তি নেই। এটি নিজে নিজে কোন প্রকার নড়াচড়া করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঐ লাশের সাথে এক বিছানায় ঘুমাতে ভয় পায়। এ ভয়ের অর্থ এটা নয় যে, ঐ ব্যক্তি এ লাশ প্রাণহীন হওয়ায় বিশ্বাসী নয়। নিঃসন্দেহে সে ঐ লাশ প্রাণহীন হওয়ার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কিছু সন্দেহ তাকে পেরেশান করে। তদ্রুপ প্রতিটি মুসলমানও এ সকল বাহ্যিক উপকরণকে অক্ষম মনে করে, কিন্তু তার অন্তরে এতটুকু শক্তি নেই যে, সে তার সন্দেহকে নিজের উপর প্রবল হতে বাধা দিতে পারে। যদি এ শক্তি পয়দা হয়ে যায়, তাহলে 'আমলী তাওহীদের মাকাম' তার জন্য এমনি এমনি অর্জিত হয়ে যাবে। হযরত খাজা আজীজুল হাসান মাজযুব (রহঃ) বলেন,

کچھ بھی مجنوں! جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تو نے لیلی جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

অর্থঃ হে মজনু! তোমার যদি সামান্যও দিব্য দৃষ্টি হাসিল হয়,

তাহলে তুমি যাকে প্রেমাস্পদ মনে করেছো, তাকে অহেতুক মনে হবে।

অন্তরের এ শক্তি বিভিন্ন ধরনের 'মুরাকাবাহ্' (ধ্যান) দ্বারা অর্জিত হয়। দুনিয়ার প্রতিদিনের ঘটনাবলীর উপর যখন মানুষ একাগ্রতার সাথে

দৃষ্টিপাত করে এবং দেখে যে, মানুষের বানানো পরিকল্পনা কিভাবে ধুলোয় মিশে যায়, তখন ধীরে ধীরে তার অন্তর থেকে সন্দেহের কালো মেঘ কেটে যেতে থাকে এবং 'তাওহীদের আক্বীদা' তার শিরা-উপশিরায় বিস্তৃত হয়ে এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। অবশ্য মুরাকাবার (ধ্যানের) ক্ষেত্রে কোন কামেল পীরের পথ নির্দেশের প্রয়োজন হয়, যাতে তিনি লোকদেরকে বাড়াবাড়ি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেন।

বাড়াবাড়ি সম্পর্কে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। (১) প্রথম কথা এই যে, এ জগতের ভাল-মন্দ সব কিছুর স্রষ্টা যদিও আল্লাহপাক এবং মানুষের শান্তি ও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকেই পৌঁছে থাকে, দুঃখও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকেই পৌঁছে থাকে; কিন্তু আদব হলো, ছোট থেকে ছোট মঙ্গলের সম্পর্কও আল্লাহপাকের দিকে করবে, তবে মন্দের সম্পর্ক ছোট থেকে ছোট হলেও আল্লাহপাকের দিকে করবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

অর্থাৎ, আল্লাহপাক মানুষের জন্য রহমতের যে দরজা খুলে দেন তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। আর তিনি যে জিনিসকে বন্ধ করে দেন তিনি ব্যতীত তা উন্মুক্তকারী কেউ নেই। (সূরা ফাতির ২)

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহপাক 'উন্মুক্ত করা' এর সাথে 'রহমত' এর উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে 'বন্ধ করা' এর সাথে রহমত শব্দ উল্লেখ করেননি বরং 'যে জিনিস' বলেছেন, কিন্তু 'জিনিস' এর ব্যাখ্যা করেননি। এতে এই তালীম দেওয়া হয়েছে যে, রহমত বন্ধ করার সম্পর্ক আল্লাহপাকের দিকে করাটা আদবের পরিপন্থী। এতে এই তত্ত্বও নিহিত আছে যে, কোন জিনিস যদি বাহ্যিক ও আপাত দৃষ্টিতে রহমতের পরিপন্থী বলে মনে হয়, তাহলে সেটাও জগতের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি হযরত ইবরাহীম (আঃ) অনুসরণ করেছেন। কুরআনে কারীমে আছে যে, তিনি

সকল কল্যাণকর জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহ্‌পাকের দিকে করতেন। যেমন, তিনি বলেছেন আল্লাহ্‌পাক আমাকে হেদায়েত দান করে থাকেন। তিনি আমাকে খাওয়ান, পান করান। অতঃপর তিনি বলেছেনঃ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

অর্থাৎ, আর যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করেন। (সূরা আশ শো'আরা ৮০)

এখানে হযরত ইরবাহীম (আঃ) আরোগ্য দানের সম্পর্ক আল্লাহ্‌পাকের দিকে আর অসুস্থ হওয়ার সম্পর্ক নিজের দিকে করেছেন। এরূপভাবে হযরত খিজির (আঃ) এক জায়গায় বলেছেনঃ

فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا

(অর্থাৎ, সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক।

(সূরা আল কাহাফ ৮২)

এ আয়াতে তিনি ভাল কাজের সম্পর্ক আল্লাহ্‌পাকের দিকে করেছেন। কিন্তু (হযরত খিযির (আঃ) যখন মুছা (আঃ)-এর সামনে এতীমদের নৌকা ফুটো করলেন তখন) নৌকার কাহিনীতে বললেনঃ

فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا

(অর্থাৎ, আমি এই নৌকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করলাম।)

(সূরা কাহাফ ৭৯)

এ আয়াতে যেহেতু عيب (ত্রুটি বা ক্ষতি) শব্দ এসেছে, এজন্য এর সম্পর্ক তিনি নিজের দিকে করলেন।

এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম মাসয়ালা লিখেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের জন্য কেবলমাত্র خالق الكلاب والخنازير (অর্থাৎ, শুয়োর ও কুকুরের স্রষ্টা) শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

(২) আরেকটি কথা হলো, যদিও জগতের সকল ঘটনার সংগঠক এবং আসল কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক, কিন্তু ইসলামী শরী'অত বাহ্যিক

উপকরণকে দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রে একেবারে আলোচনা- বহির্ভূত রাখেনি। বরং বাহ্যিক উপকরণেরও কিছু হক আছে। এর কারণ এই যে, প্রকৃত কর্তা এবং সংগঠক নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহপাক, কিন্তু আল্লাহপাক যে জিনিসকে কাজটি সংগঠিত হওয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন, তারও একটি পজিশন আছে। সুতরাং কেউ যদি আপনার প্রতি অনুগ্রহ করে, তাহলে তার শোকরিয়া আদায় করা আপনার জন্য ওয়াজিব। এর দৃষ্টান্ত উলামায়ে কেরাম এরূপ লিখেছেন যে, ইলম হাসিল করার জন্য যে সকল উপকরণ আছে, যেমন দোয়াত, কলম, কাগজ ইত্যাদি ছাত্রদের জন্য ঐ সবের সম্মান রক্ষা করাও জরুরী।

অবশ্য এ সকল মাধ্যমের এবং বাহ্যিক উপকরণের কতটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কোথায় লক্ষ্য রাখতে হবে না- এ পার্থক্যটির প্রতি 'আমলী তাওহীদ' এর পথের পথিকদের জন্য দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বাস্তবিক পন্থায় এর সীমা নির্ধারণ করা শাইখে কামেল তথা কামেল পীরের রাহনুমায়ীতেই হতে পারে।

মাকামে তাওয়াক্কুল

بر توکل پایہ اشتر بند

অর্থাৎ, উটের পা বেঁধে তাওয়াক্কুল করো।

যে সকল বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমল করা ফরয, তার মধ্য হতে একটি হলো, 'তাওয়াক্কুল'। প্রকৃতপক্ষে 'তাওহীদ' এর মাকাম হাসিল করার পরই কোন ব্যক্তি 'তাওয়াক্কুল' এর মাকাম হাসিল করতে পারে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে বার বার তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আজকের মজলিসে তাওয়াক্কুলের হাকীকত সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

توکل (তাওয়াক্কুল) একটি আরবী শব্দ, যা "وكالة" শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো, কারো প্রতি ভরসা করে কোন কাজ তার উপর অর্পণ করা। ইসলামী পরিভাষায় 'তাওয়াক্কুল' বলা হয়, দুনিয়াবী আসবাব-পত্র ও উপায়-উপকরণের উপর ভরসা না করে,

আল্লাহ্‌পাকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে, নিজের সকল কাজ-কর্ম তাঁর নিকট সঁপে দেওয়া।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, মানুষ যখন কাউকে আস্থাভাজন মনে করে তার উপর ভরসা করে, তখন তার মধ্যে কি কি গুণাবলী দেখতে চায়? গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, কোন ব্যক্তি তখনই আস্থাভাজন হতে পারে, যখন তার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায়। (১) ইলম, (২) ক্ষমতা, (৩) সহমর্মিতা ও সহানুভূতি।

অর্থাৎ, প্রথমতঃ আপনি যে ব্যক্তির উপর ভরসা করতে চান, তার সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে চাইবেন যে, সে আপনার সম্পর্কে, আপনার অবস্থা সম্পর্কে এবং পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত কিনা। যদি না হয়, তাহলে সে আপনার কোনই উপকার করতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ আপনি এটাও দেখবেন, যে কাজের দায়িত্ব আপনি তাঁর উপর ন্যস্ত করতে চান, সে, সে কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী কিনা? যদি না হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, সে যদি ঐ ব্যাপারে অক্ষম হয়, তাহলে সে আপনার কি সাহায্য করবে? অর্থাৎ, কোন সাহায্যই করতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ আপনার কামনা এটা হবে যে, আপনি যে ব্যক্তির উপর ভরসা করেছেন, সে যেন আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আপনার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়। অন্যথায় তার জ্ঞানের গভীরতা এবং চমৎকার যোগ্যতা আপনার কোন কাজে আসবে না।

এখন আপনি আপনার আশে-পাশে দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে পান? যার মধ্যে এই তিনটি গুণই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে এবং জীবনের সকল ব্যাপারে আপনি তার ইলম, ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর ভরসা করতে পারেন! আপনি যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হওয়ার পরিচয় দিতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনার উত্তর না সূচক হবে। ব্যাপক অনুসন্ধানের পরও আপনি এমন কোন লোক খুঁজে পাবেন না, যার মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, যাতে আপনি নিজ জীবনের সকল ব্যাপার তাকে সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

এখন আপনি মহান আল্লাহপাকের ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, আল্লাহপাকের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি গুণই এমন পূর্ণতার সাথে আছে যে, এর চেয়ে অতিরিক্ত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। কাজেই আল্লাহপাকই এমন এক সত্ত্বা এবং তিনিই এর একমাত্র যোগ্য যে, মানুষ তার জীবনের সকল কাজ তাঁকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং সকল ব্যাপারে তাঁর উপর ভরসা রাখবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহপাকের উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (সূরা আল ইমরান ১২২)

তাওয়াক্কুল তিন প্রকার

যেহেতু তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে লোকেরা সাধারণতঃ ভুল করে থাকে, সেহেতু প্রথমে জানা দরকার যে, তাওয়াক্কুল তিন প্রকার।

(১) তাওয়াক্কুলের একটি পদ্ধতি হলো, চিন্তা ও আদর্শগতভাবে নিজের সকল ব্যাপার আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দেওয়া। কিন্তু কার্যত তার দৃষ্টি উপায়-উপকরণের প্রতি আবদ্ধ থাকে এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি তার আত্মিক মনোযোগ থাকে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, আপনি আপনার মামলা-মোকাদ্দমা কোন একজন উকিলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন এবং তার উপর আপনার ভরসাও হয়, কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা উকিলের দায়িত্বে দিয়ে একেবারে দায়িত্ব মুক্ত ও নিশ্চিত হতে পারেন না। বরং সর্বদা আপনার লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টা উকিলের সাথে লেগে থাকে।

(২) তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, আপনি বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে কেবলমাত্র আল্লাহপাকের হুকুম পালনার্থে ব্যবহার করে থাকেন। অতঃপর সর্বক্ষণ এ ধারণা জাগ্রত রাখেন যে, এ সকল বাহ্যিক আসবাব-পত্রের কোন হাকীকত নেই। কর্ম সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহপাক। তাই সকল কিছু আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দিচ্ছি। এজন্য আপনার অধিক মনোযোগ আল্লাহর স্মরণে এবং তাঁর

নিকট নিজ প্রয়োজন বর্ণনা করার দিকে থাকে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন শিশুর যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন সে তার মাকেই ডাকে। নিজে নিজে সামান্য যে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে এতে সে নিশ্চিত হয় না। তার মনোযোগ এদিকেই থাকে যে, কিভাবে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। মা-ই তার সকল কষ্ট দূর করে দিবে।

(৩) তাওয়াক্কুলের তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, আল্লাহপাকের প্রতি এত উচ্চ পর্যায়ের ভরসা করা যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি কোন দৃষ্টি করা হয় না। এমনকি (সাহায্যের জন্য) আল্লাহকে ডাকেও না। বরং সে মনে করে আল্লাহপাকতো স্বয়ং আমার দুঃখ-বেদনা দেখছেন। তিনি নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, নমরূদ যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাযির হয়ে বললেনঃ যদি কোন খেদমতের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি হাজির আছি। এর উত্তরে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) বললেন

اما اليك فلا، واما الله فهو يعلم مابى

অর্থাৎ, আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমি আল্লাহর মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি আমার অবস্থা নিজেই জানেন।

তাওয়াক্কুলের উপরোক্ত তিন প্রকার হতে প্রথম প্রকার সাধারণ মানুষের তাওয়াক্কুল, যা একেবারে নিম্ন স্তরের তাওয়াক্কুল। তৃতীয় প্রকারটি তাওয়াক্কুলের হাকীকতের দিক দিয়ে অনেক উচ্চ স্তরের। কিন্তু এটা আম্বীয়াদের (আঃ) এবং উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গদের বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। স্থায়ীভাবে কর্মপন্থা বানানোর জন্য এটা শরী'অতে উদ্দেশ্য নয়।

শরী'অতে উদ্দেশ্য হলো, তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় প্রকার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকেই সুন্নাত বলেছেন। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে সাধারণভাবে অবলম্বন করবে, (সাথে সাথে) আল্লাহপাকের নিকট দু'আও করবে। কিন্তু ভরসা ঐ বাহ্যিক আসবাবপত্রের পরিবর্তে আল্লাহপাকের উপরই রাখবে।

তাওয়াক্কুল এবং উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ প্রসংগ

بر توکل پایه اشتربه بند

অর্থাৎ, উটের পা বেঁধে তাওয়াক্কুল করো।

কতিপয় অনভিজ্ঞ লোক 'তাওয়াক্কুল' শব্দটির মারাত্মক ধরনের ভুল প্রয়োগ করেছে। তারা বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে নাম রেখেছে। কোন কোন সূফীয়ায়ে কেরামের বক্তব্য ও কবিতায় উপায়-উপকরণ বর্জন করার যে প্রসংশা বর্ণিত হয়েছে, এটাকে তারা দলীল রূপে পেশ করে থাকে। অথচ ঐ সকল সূফীয়ায়ে কেরামের এ বক্তব্য ও কবিতা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের এই হাকীকতকে তোমরা সর্বদা লক্ষ্য রেখো যে, বাস্তবে এগুলোর উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। উপকার বা ক্ষতি করার সকল ক্ষমতাই আল্লাহপাকের কব্জায়। তাদের উদ্দেশ্য এটা কখনো ছিলো না যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হোক।

এখানে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ বর্জন করার মাসয়ালাটি বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি।

বাস্তব অবস্থা হলো, মানুষ এ দুনিয়ায় যত কাজ-কর্ম করে, তার দ্বারা হয়তো جلب منفعت (উপকার লাভ করা) উদ্দেশ্য হয় অথবা حفظ منفعت (উপার্জিত লাভের সংরক্ষিত করা) উদ্দেশ্য হয়। অথবা دفع مضرت (ক্ষতির প্রতিরোধ করা) উদ্দেশ্য হয়। এই তিনটি উদ্দেশ্যের জন্যই সমগ্র দুনিয়া দিবা-রাত্রি ব্যস্ত থাকে। আল্লাহপাক এই তিনটির প্রতিটি কাজের জন্য কিছু উপায়-উপকরণ বানিয়েছেন। সেই উপায়-উপকরণ তিন প্রকার। (১) ইয়াকীনী (নিশ্চয়তা প্রদানকারী) (২) সন্দেহমূলক উপায়-উপকরণ (৩) গোপন আসবাব-পত্র।

(১) ইয়াকীনী (নিশ্চয়তা প্রদানকারী) উপায়-উপকরণ এর অর্থ হলো, যে সকল উপকরণ ব্যবহারে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী ও কাংখিত ফল পাওয়া যায়। যেমন, ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য সামনে আছে, এতে এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, খাদ্য খেলে ক্ষুধা দূর হবে। এ ধরনের উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করাকে তাওয়াক্কুল বলা যাবে না। এটাকে পাগলামী বলা হবে এবং এটা হারাম।

(২) সন্দেহমূলক আসবাবপত্র। অর্থাৎ, কোন কাজের এমন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা যার দ্বারা কাংখিত ফলাফল হাসিল হওয়াটা ইয়াকীনী নয়, তবে সাধারণতঃ ঐ ফল লাভ হয়ে থাকে। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা লাভ করা। এ ধরনের আসবাবপত্র ত্যাগ করার দু'টি পন্থা (১) প্রথম পন্থা এই যে, উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা এবং উপায়-উপকরণের পরিবেশেও না থাকা। যেমন, মানব বসতী ত্যাগ করে বনে গিয়ে বসবাস শুরু করা। এটা শরী'অতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। (২) দ্বিতীয় পন্থা এই যে, উপায়-উপকরণের পরিবেশে থেকেও তা পরিত্যাগ করা। যেমন, মানব সমাজে মানুষের সাথে বসবাস করেও জীবিকা উপার্জনের চিন্তা-ফিকির ত্যাগ করা। সাধারণ অবস্থায় এটাও জায়েয নয়। কিন্তু কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়েয আছে।

শর্তসমূহ নিম্নরূপ

(ক) পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট না হওয়া। অর্থাৎ কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শরী'অত কর্তৃক তার উপর অর্পিত না হওয়া।

(খ) দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন এবং কাজে পোক্ত হওয়া।

(গ) সর্ব অবস্থায় আল্লাহপাকের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

(ঘ) কারো নিকট প্রকাশ্যে বা ইশারায় কোন কিছু না চাওয়া।

উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে কেউ যদি আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য জীবিকা উপার্জনের উপায় পরিত্যাগ করে, তাহলে এটা জায়েয হবে। কিন্তু উপরোক্ত শর্তাবলী হতে একটি শর্তও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এটা না জায়েয এবং নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যে সকল বুযুর্গ সম্পর্কে একথা বর্ণিত আছে যে, তারা উপায়-উপকরণ ত্যাগ করে বসেছিলেন, তাঁদের অবস্থা এমনই ছিলো যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহপাকের ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন এবং কাজে পোক্ত ছিলেন। তাঁরা অনাহারে থাকা সত্ত্বেও কেউ তাদেরকে দেখে ধারণাই করতে পারতো না যে, ইনি অভুক্ত আছেন কিংবা এই ব্যক্তির টাকা-পয়সার কোন প্রয়োজন আছে। পবিত্র কুরআনে 'আসহাবে সুফ্‌ফার' অবস্থা এমনই বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (البقرة)

অর্থাৎ, (তাদের অবস্থা সম্পর্কে) অনবহিত লোকেরা তাদের না চাওয়ার কারণে তাদেরকে ধনী মনে করে! (বাকারা ২৭৩)

এক্ষেত্রে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যে সকল সাহাবী (রাঃ) এবং বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে জীবিকা উপার্জনের উপায়-উপকরণ ত্যাগ করার কথা বর্ণিত আছে, সেটা কোন দ্বীনী প্রয়োজন অথবা আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা হিসেবে ছিলো। অন্যথায় স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তম পন্থা এটাই যে, মানুষ জীবিকার জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন করবে। আর এটা কোন অবস্থাতেই তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। আম্বিয়া (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গদের তাওয়াক্কুল এটাই যে, তারা জীবিকার উপায় অবলম্বন করতেন ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি থাকতো সর্বদা আল্লাহপাকের প্রতি নিবদ্ধ।

চমৎকার কাহিনী

ফারসী ভাষার প্রসিদ্ধ কিতাব "আনোয়ারে সুহাইলি"তে একটি হেকমতপূর্ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি হলো, এক ব্যক্তি একটি এমন কাক দেখলো, যার পাখা সম্পূর্ণরূপে কাটা ছিলো, যার দরুণ সে উড়তে পারতো না। এ লোক মনে মনে ভাবলো যে, এই অসহায় কাকটি কিভাবে বেঁচে আছে? এর জন্য খাদ্য কোথা থেকে জোগাড় হয়? সামান্যক্ষণ পরেই সে দেখলো যে, একটি ঈগল পাখি তাঁর ঠোটে করে একটি শিকার নিয়ে কাকের নিকট হাজির হয়ে শিকারটি কাকের মুখে তুলে দিলো। ঐ ব্যক্তি এ দৃশ্য দেখে, মনে মনে চিন্তা করলো, আল্লাহপাক স্বীয় মাখলুককে এভাবেও রিযিক (জীবিকা) দান করে থাকেন! তাহলে আমি জীবিকা উপার্জনের চিন্তা কেন করবো? আল্লাহপাক নিজেই আমার জন্য রিযিক পাঠাবেন।

সুতরাং সে হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়লো। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সে কিছুই পেলো না। অতঃপর কোন এক বুদ্ধিমান লোক তাকে বুঝিয়ে বললো, তোমাকে দু'টি পাখি দেখানো হয়েছে। একটি পাখা কর্তিত কাক। অপরটি ঈগল। তুমি কাক হওয়াকে কেন প্রাধান্য দিলে? ঈগল হওয়ার খেয়াল কেন হলো না– যে ঈগল নিজের খাদ্যের জোগাড়ও করছে এবং অন্য আরেক অসহায়ের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করছে?

এ ঘটনাটি তাওয়াক্কুলের যথাযথ হাকীকতের উপর নির্দেশনা করে থাকে। যে ব্যক্তির নিকট সহায়-সম্পদ ও আসবাব-পত্র আছে, তার জন্য এসব পরিত্যাগ করা ভুল। সহায়-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ সম্পন্ন ব্যক্তি ঐ ঈগলের ন্যায়। তার নিজের খাদ্যের সংস্থান করার সাথে সাথে অন্যের জন্য খাদ্যের সংস্থান করা উচিত। অবশ্য কোন লোক যদি উযর-আপত্তি কিংবা অসহায়ত্বের কারণে সহায়-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ হতে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার জন্য এই চিন্তাও ভুল যে, রিযিকের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে? তার সর্বক্ষণ এই চিন্তা করা উচিত যে, আসবাবপত্র ও উপায়-উপকরণতো মাধ্যম বৈ নয়। আসল রিযিক দাতা হলেন আল্লাহ। যদি তিনি জীবিত রাখতে চান, তাহলে কোন না কোন উপায়ে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

বুযুর্গানে দ্বীন এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যে, উপরোক্ত যে সকল অবস্থায় উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করা জায়েয, সে সকল অবস্থায় স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা উত্তম, নাকি স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ ও আসবাব-পত্র পরিত্যাগ করে তাওয়াক্কুল করা উত্তম?

শাইখ আব্দুল্লাহ তাছতারী (রহঃ) লিখেছেন, উপায়-উপকরণ ও আসবাব-পত্র অবলম্বন করার কারণে যদি কেউ কোন ব্যক্তির সমালোচনা করে, তাহলে সে যেন আল্লাহপাকের হিকমতের উপর আপত্তি উত্থাপন করে। আর যে ব্যক্তি জায়েয অবস্থায় স্বাভাবিক আসবাব-পত্র পরিত্যাগ করার উপর আপত্তি করে, সে যেন তাওহীদের হাকীকতকে অস্বীকার করে। সুতরাং এ ধরনের অবস্থায় যদিও উপায়-উপকরণ অবলম্বন এবং পরিত্যাগ করা উভয়টিই জায়েয আছে, কিন্তু সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ পন্থা এটাই, যার শিক্ষা আম্বিয়া (আঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) দিয়েছেন এবং এটাই তাঁদের সুন্নাত ছিলো যে, উপায়-উপকরণ ও আসবাবপত্র অবলম্বন করবে কিন্তু সকল ভরসা আল্লাহপাকের প্রতি রাখতে হবে। আসবাব-পত্রকে কার্য ক্ষমতা সম্পন্ন মনে করা যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে, যে বলেছিলো, 'আমি উটকে ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো,? নাকি রশি দিয়ে বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করবো?)' ইরশাদ করেছেনঃ اعقلها وتوكل (অর্থাৎ, উটের পায়ে রশি বেঁধে অতঃপর তাওয়াক্কুল করো। (তিরমিযী শরীফ ২ঃ৭৮)

হাদীছের সাদাসিধে সংক্ষিপ্ত বাক্যে উপরোক্ত হাকীকতের দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

বিশেষ করে বর্তমান যুগে তাওয়াক্কুলের সঠিক নিয়ম এটাই যে, স্বাভাবিক উপায়-উপকরণ ও আসবাব-পত্র ব্যবহার করবে ঠিকই কিন্তু ভরসা সব সময় আল্লাহপাকের উপর রাখবে। কেননা যে সকল ক্ষেত্রে আসবাব-পত্র পরিত্যাগ করা জায়েয আছে, সে সকল ক্ষেত্রে আসবাবপত্র পরিত্যাগ করলে আজ-কাল হাজারো ফিতনা ফাসাদ ও বিড়ম্বনার আশংকা আছে। কমপক্ষে এক্ষেত্রে অহংকারতো সৃষ্টি হয়ে যায়।

(৩) **গোপন আসবাবপত্র।** হ্যাঁ! আসবাবপত্রের আরেকটি প্রকার যাকে গুপ্ত উপায়-উপকরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। সেটা হলো, কাজ থেকে দূরের এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম চেষ্টা-তদবীরের পিছনে লেগে থাকা। এটা অবশ্যই তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

ইসলামের শিক্ষা হলো, যে উদ্দেশ্য সাধন করা মাকসুদ হয়, তার জন্য সহায়ক কাছাকাছি ঐ সকল বাহ্যিক আসবাব-পত্র অবশ্যই অবলম্বন করবে, যা মানুষের ক্ষমতায় আছে। তবে মন ও মস্তিষ্ককে লম্বা-চওড়া চেষ্টা-তদবীরের চিন্তা-ফিকির হতে দূরে রাখতে হবে। হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাটিকে এভাবে বলেছেনঃ

اجملوا فى الطلب خذ واما حل ودعوا ماحرم

অর্থাৎ, কোন জিনিস লাভ করার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে তদবীর করো এবং হালালকে গ্রহণ করো এবং হারামকে পরিত্যাগ করো।

(ইবনে মাজাহ ১৫৫)

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল ব্যক্তির আলোচনা করেছেন, যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তিনি তাদের মধ্যে ঐ সকল লোকের কথাও বলেছেন, যারা لايكتوون (অর্থাৎ, দাগানোর চিকিৎসা যারা অবলম্বন না করতো। (বুখারী শরীফ ২ঃ৮৫০, মুসলিম ১ঃ১১৬))

এ হাদীছেও এ কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম চেষ্টা-তদবীরের পিছনে পড়া ইসলামে পছন্দনীয় নয়। কারণ আরবদের মধ্যে লৌহ খন্ড উত্তপ্ত করে দাগ লাগানোকে জীবনের শেষ চিকিৎসা বলে মনে করা হতো। আরবী প্রসিদ্ধ প্রবাদ, آخر الدواء الكى (অর্থাৎ,

সর্বশেষ চিকিৎসা হলো, দাগ লাগানো।) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাসও এই ছিলো যে, হাতের কাছের চেষ্টা-তদবীর অবলম্বন করার পর এই দু'আ করতেনঃ

اللهم هذا الجهد وعليك التكلان

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এটা আমার চেষ্টা, আর ভরসা আপনারই উপর)

তদবীর ও দু'আর কাহিনী

১৮৫৭ সালের জিহাদে দিল্লীর কয়েকজন বুযুর্গ একটি বাড়ীতে আটকা পড়ে গেলেন। বাইরে তখন ব্যাপকহারে গণহত্যা চলছিলো, এজন্য তারা বের হতে পারছিলেন না। বাড়ীতে যতটুকু পানির ব্যবস্থা ছিলো, দু' তিন দিনে তা শেষ হয়ে গেলো। যখন সকলেই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন, তখন একজন বুযুর্গ একটি পানির পেয়ালা নিয়ে 'পরনালার' (বৃষ্টির সময় ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য যে পাইপ লাগানো হয়) নীচে রেখে দিয়ে এই দু'আ করতে লাগলেন। "হে আল্লাহ! আমার সাধ্যের কাজতো এতটুকুই ছিলো। এখন বৃষ্টি বর্ষণ করা আপনার কাজ। সুতরাং আল্লাহপাকের দয়ায় বৃষ্টি হলো, সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলেন।

সারকথা এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়াবী উপায়-উপকরণ একেবারে পরিত্যাগ করা ভুল। তবে তাওয়াক্কুলের অর্থ এই যে, উপায়-উপকরণ ও আসবাব-পত্রের প্রকৃত অবস্থা সর্বদা মনে রাখবে। আর কোন অবস্থাতেই বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর ভরসা রাখবে না। সংক্ষিপ্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় উপায়-উপকরণ ও আসবাব-পত্র অবলম্বন করবে এবং সকল বিষয় আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দিবে।

অবশ্য বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে ভারসাম্য রক্ষা করে এ পথ অবলম্বন করা খুবই কঠিন কাজ। সাধারণতঃ তাওয়াক্কুলের এই মাকাম কোন কামেল শাইখের রাহনুমায়ী ব্যতীত হাসিল করা সম্ভব হয় না। এজন্য তাওয়াক্কুলের এই মাকাম হাসিলের সঠিক পন্থাও এটাই যে, কোন কামেল শাইখের শরণাপন্ন হয়ে নিজের (আধ্যাত্মিক) অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁকে অবগত করে তাঁর পথ নির্দেশ অনুসারে আমল করা।

সমাপ্ত

দৈনন্দিন আমল
ও
আত্মশুদ্ধির সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

মূল

আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী (রহঃ)

বিশিষ্ট খলীফাঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান

দাওরা ও ইফতাঃ জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী

উস্তাযুল হাদীছঃ জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

—৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

বিগত মজলিস সমূহে 'তাছাওউফ' ও তরীকতের হাকীকত এবং তাঁর মূল ও প্রাথমিক বিষয়াবলী বিভিন্ন শিরোনামে বর্ণনা করেছি। যার সারাংশ এই যে, আল্লাহপাক স্বীয় বান্দাদের জন্য যে জীবন বিধান অর্থাৎ করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী দান করেছেন, তা দুই প্রকার (১) যে সকল বিধানের সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে, তাকে শরী'অত বলা হয়। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয হওয়ার বিধান এবং মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিধান, (২) তদ্রুপ কতিপয় বিধান এমন আছে যার সম্পর্ক মানুষের আভ্যন্তরীণ আমলের সাথে। যেমন, ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, ইখলাস ইত্যাদি, আধ্যাত্মিক আমল ফরয হওয়ার বিধান। একথাও পূর্বে বয়ান করা হয়েছিলো যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের আভ্যন্তরীণ আমলের উপরই বাহ্যিক তথা দৈহিক আমলের ভিত্তি। যদি কোন লোক বাতেনী 'ফাযায়েল' তথা আত্মার গুণে গুণান্বিত হয় এবং স্বীয় আত্মার রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে 'রাযায়েল' অর্থাৎ, আত্মার ময়লা থেকে পবিত্র হয়ে থাকে, তাহলে তার বাহ্যিক আমলও দুরস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বাতেনী আমলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে বাহ্যিক আমলও সব সময় অসম্পূর্ণ থাকে। কাজেই আল্লাহর পথের সকল পথিক এবং সকল মুসলমানের

জন্য আত্মশুদ্ধি ও আত্মাকে উত্তম গুণাবলীতে সজ্জিত করা অত্যন্ত জরুরী। এ উদ্দেশ্যেই তরীকত তথা আল্লাহ প্রাপ্তির রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের সাধনা ও মুজাহাদা করানো হয়। যাতে আত্মশুদ্ধির পর দ্বীনের সকল আহকামের উপর আমল করা সহজ হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য রূহানী ডাক্তার অর্থাৎ, শাইখ ও পীরের শরণাপন্ন হওয়া প্রকৃতিগতভাবেই আবশ্যক। এই চিকিৎসার নিয়ম এই যে, 'সালেক' অর্থাৎ, আল্লাহর পথের পথিক নিজের বিভিন্ন অবস্থা স্বীয় পীর ও মুর্শিদের নিকট খুলে বলবে। পীর সাহেব বা 'মুসলেহ্' ভক্ত বা মুরীদের অবস্থানুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা নিবেন। এ চিকিৎসার জন্য শর্ত হলো, পীর সাহেবের প্রতি মুরীদের গভীর ভক্তি এবং তার প্রকৃতি ও মেযাজের সাথে সামঞ্জস্য থাকা। যাতে মুরীদ নিঃসঙ্কোচে পীর সাহেবের উপদেশ মুতাবিক আমল করতে পারে। কোন কোন সময় পীর সাহেব মুরীদকে সংশোধনের তাদবীরের সাথে সাথে কিছু যিকির-আযকার ও অযীফার প্রস্তাব দেন। এ সকল যিকির-আযকার ও অযীফার বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত এর উপর আমল করতে থাকলে নেক কাজের প্রতি আত্মার আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়, ফলে আত্মার সংশোধন সহজ হয়ে যায়। যিকির-আযকার এবং তাছবীহ-তাহলীলের ফলাফল এভাবে প্রকাশ পায় যে, অন্তরে খোদাভীতি ও তাকওয়ার ভাব মজবুত হতে থাকে।

সকল যুগের পীর ও মাশায়েখগণ সে যুগের আল্লাহর পথের পথিকদের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের জন্য তাদের অবস্থা ও মেযাজ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র ও তাদবীর নির্ধারণ করেছেন। বর্তমান যুগে আমাদের জীবন-যাপন অনেক জটিল হয়ে গেছে এবং ব্যস্ততাও অনেক বেড়ে গেছে। এ কারণেই এ যুগের সালেকদের জন্য এমন সহজ অথচ উত্তম ফলদায়ক তাদবীর ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, যার উপর সহজে আমল করা সম্ভব হয়।

এদিক বিবেচনা করে আমি আমার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের- বিশেষ করে আমার শাইখ ও মুর্শিদ [হযরত থানভী (রহঃ)] থেকে হাসিলকৃত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও খুবই উপকারী دستور العمل (কর্মনীতি) পেশ করছি। ইনশাআল্লাহ! এই কর্মনীতি ও কার্যসূচী লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌছার জন্য (অর্থাৎ, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য) যথেষ্ট হবে।

সময় মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং শ্রেষ্ঠ পূঁজি। প্রতি মুহূর্তেই বয়স কমছে। সুতরাং আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য আর অপেক্ষা করার অবকাশ নেই। আমার অনুরোধ আজ থেকেই কাজ শুরু করুন। আত্মশুদ্ধির জন্য যে সিলেবাসের কথা বলা হচ্ছে, কালক্ষেপণ না করে তার উপর আমল আরম্ভ করে দিন। অত্যন্ত কঠোর ও দীর্ঘমেয়াদী মুজাহাদা ও সাধনার পরিবর্তে এটি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিক্ষিত সিলেবাস। সামান্য মনোযোগ, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেই এর উপর আমল করা যাবে। والله الموفق

বিনীত
আব্দুল হাই

দু'টি কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী (রহঃ) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) ঐ সকল বিশেষ খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক قحط الرجال (যোগ্য লোকের অভাব) এর এই যুগে দ্বীনের দাওয়াত এবং বিশেষতঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ)-এর ফয়েয ও প্রজ্ঞার প্রচার ও প্রসারের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

তিনি প্রতি সোমবার তাঁর ভক্ত ও মুরীদদের একটি বিশেষ মজলিসে 'তাছাওউফ' ও 'তরীকতের' হাকীকত এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিল ও কঠিন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন।

একুশ জুমাদাছ্ ছানিয়াহ্ ১৩৯৮ হিজরী সোমবারে তিনি তাঁর ভক্তদের জন্য আত্মশুদ্ধি বিষয়ক দৈনন্দিন আমলের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বয়ানের মাধ্যমে পেশ করেন। এ সিলেবাসটি যেহেতু সত্যানুসন্ধি আল্লাহ্র পথের পথিকদের জন্য ইনশাআল্লাহ খুবই উপকারী হবে, তাই আমরা যারা হযরতের খাদেম ছিলাম, তাদের খেয়াল হলো, এই বয়ানটিকে (পুস্তক আকারে) প্রকাশ করার। সুতরাং হযরত (রহঃ)-এর সম্পাদনা ও অনুমতিক্রমে এই বয়ানটিকে বিশেষ ও সাধারণ শ্রেণী তথা সকল মুসলমানদের উপকারের জন্য প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহপাক আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে এই বয়ানের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

হযরত আরেফী (রহঃ)-এর এক নগণ্য খাদেম

মুহাম্মদ তাক্বী উছমানী

সম্পাদক, মাসিক আল বালাগ

দারুল উলূম, করাচী

দৈনন্দিন আমল ও আত্মশুদ্ধির সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

দৈনন্দিন আমলসমূহ

(১) সর্বপ্রথম আমার পরামর্শ হলো, আপনি আপনার দিবা-রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি রুটিন তৈরী করে নিন। কারণ রুটিন অনুযায়ী কাজ করলে কাজে খুবই বরকত হয়। অল্প সময়ে অনেক কাজ করা যায়। রুটিনের বরকতে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

(২) শরী'অতের আহকাম সমূহের (করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী) উপর আমল করা সর্বাবস্থায় ফরয এবং ওয়াজিব। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপরও আমল করতে হবে।

(৩) যথাসম্ভব জামা'আতে নামায আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে। শর'য়ী উযর (শরী'অত স্বীকৃত অপরাগতা) ব্যতীত মসজিদের জামা'আত তরক করা (বাদ দেওয়া) থেকে বিরত থাকবে। মসজিদের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

(৪) প্রতিদিন ফজর নামাযের পর অথবা নিজ সুবিধানুযায়ী সময় নির্ধারণ করে নিম্নোক্ত কাজগুলোকে দৈনন্দিন আমলরূপে গ্রহণ করে যত্নের সাথে তার উপর আমল করবে।

(ক) প্রতিদিন পবিত্র কুরআন হতে এক পারা, সম্ভব না হলে আধা পারা, এটাও যদি মুশকিল হয়, তাহলে এক চতুর্থাংশ পারা, (এর চেয়ে কম নয়,) যথাসম্ভব সহীহ-শুদ্ধরূপে তাজবীদ সহ তিলাওয়াত

করবে। যদি কোন দিন ঘটনাক্রমে অথবা অসুবিধার কারণে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা না হয়, তাহলে দুইশতবার 'সূরা ইখলাস' পড়ে তার ক্ষতিপূরণ করবে।

(খ) তিলাওয়াতের পর 'মুনাজাতে মাকবুল' হতে এক মঞ্জিল, অন্যথায় আধা মঞ্জিল পাঠ করবে। সাথে সাথে অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে।

(গ) অতঃপর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ এই দু'আ এক তাছবীহ্ অর্থাৎ একশতবার পাঠ করবে এবং

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

একশত বার পাঠ করবে।

(ঘ) ইস্তিগফার অর্থাৎ, اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ একশতবার পাঠ করবে।

(ঙ) দুরূদ শরীফ অর্থাৎ,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

একশত বার পাঠ করবে।

(চ) لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ একশতবার পাঠ করবে।

(ছ) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দুই হাজারবার অন্যথায় কমপক্ষে পাঁচশতবার পাঠ করবে।

(জ) প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, চার কুল (অর্থাৎ, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) একবার করে এবং তাছবীহে ফাতেমী (অর্থাৎ, ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পাঠ করবে।

(ঝ) ইশা নামাযের পর (১) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ একশত বার, (২) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

একশত বার, (৩) ইস্তিগফার একশতবার, (৪) দুরূদ শরীফ একশতবার পাঠ করবে।

(ঞ) রাতে শয়নকালে আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষাংশ অর্থাৎ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, সূরা আল-ইমরানের শেষাংশ অর্থাৎ, اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ থেকে لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ পর্যন্ত, সূরা মুল্‌ক একবার, সূরা ইখলাস একশতবার (সম্ভব না হলে ৩৩ বার অন্যথায় ১১ বার) এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে পাঠ করে নিজের শরীরে দম করবে (ফুঁক দিবে) এবং বাড়ি বন্ধ করবে।

উপরোক্ত আমলসমূহ ছাড়াও চলতে-ফিরতে যখনই সুযোগ হয় لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং মাঝে মাঝে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পড়তে থাকবে। এতদ্ব্যতীত যতটুকু সম্ভব বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস করবে। যিকিরে যদি মন নাও লাগে, শুধু মৌখিকই হয় তবুও যিকির করবে। কারণ যিকিরের অভ্যাস করলে শেষ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ! এমন হবে যে, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি অন্য কাজে ব্যস্তও থাকে, তাহলে অন্তরে আল্লাহপাকের যিকির অঙ্কিত হয়ে যাবে।

(৫) দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন কাজের যে সকল দু'আ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, (যেমন খানা খাওয়ার দু'আ, মসজিদে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার দু'আ, ঘুমানোর দু'আ, জাগ্রত হওয়ার দু'আ ইত্যাদি) সেগুলো মুখস্ত করে যথাযথ সময় ও কাজে পড়ার অভ্যাস করা। কিছু দু'আ এই কিতাবের শেষাংশে দেয়া আছে।

(৬) মাঝে মাঝে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের সোহবতে গিয়ে বসবে এবং তাদের নিকট হতে নসীহত হাসিল করবে, দু'আ নিবে। এছাড়া নিজের চলা-ফেরাও যথাসম্ভব সুন্নাতের অনুসারী নেক লোকদের সাথে রাখবে।

(৭) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর ওয়ায ও বাণী সংকলণ এবং লিখিত কিতাব 'তারবিয়াতুস্ সালেক' সবসময় নিয়মিতভাবে পড়বে। উপরোক্ত কিতাবসমূহের

প্রয়োজনীয় সারাংশ আমার সংকলিত مآثر حكيم الامت ('মায়াছেরে হাকীমুল উম্মত') এবং بصائر حكيم الامت (বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত) এ এসে গেছে। এ দু'টি কিতাবও পাঠ করবে। দৈনিক অবশ্যই এগুলো নিয়মিত পড়বে। চাই এক পৃষ্ঠাই হোক না কেন, কারণ এতে ইলমের প্রশস্ততা ও দক্ষতা লাভ হবে এবং আমলের জযবা এবং চাহিদা সৃষ্টি হবে।

উল্লেখিত আমলসমূহকে নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিবে। অর্থাৎ, এ সকল আমলকে দিবা-রাত্রির কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে সর্বাবস্থায় অতি গুরুত্বের সাথে নিয়মিত আদায় করবে। এ সকল আমলকে অন্যান্য কাজের উপর প্রাধান্য দিবে। কারণ এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত মা'মূলাত (কার্যসূচী) সম্ভব নয়। এখানে যে সকল আমলের কথা বলা হলো, সবই সুন্নাত এবং প্রামাণিক।

কতিপয় মুস্তাহাব আমল

এখন আরো কিছু অযীফার কথা বলছি। এ সকল অযীফা নিজের উপর আবশ্যকীয় না করে এই নিয়ত করবে যে, যথাসম্ভব এগুলোর উপর আমল করবো। এমন যেন না হয় যে, প্রথম প্রথম উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করে এ সকল আমলকেও নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নেওয়া হলো কিন্তু কিছুদিন পর উৎসাহে ভাটা পড়লে আমল ছেড়ে দিলো। কেননা হাদীছ শরীফের ভাষ্যানুযায়ী মুস্তাহাব আমলকে নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নেওয়ার পর তা ছেড়ে দিলে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। কারণ এতে এই আশংকা আছে যে, আজ নফস ও শয়তান একটি মুস্তাহাব আমল ছাড়িয়ে দিলো, আগামীতে আল্লাহ্ই জানেন অন্য আবার কোন আমল ছাড়িয়ে দেয়। অথচ 'সালেক' তথা আল্লাহর পথের পথিকের জন্য মুস্তাহাব আমলসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং আমলের ফযীলতসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। কাজেই মুস্তাহাব আমলের ব্যাপারে এই নিয়মের অনুসরণ করবে যে, কিছু জিনিসের উপর সবসময় আমল করবে, আর

কিছু জিনিসের উপর সর্বদা না হলেও যখনই সম্ভব হয় আমল করাকে নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নিবে। সময়-সুযোগ মতো এগুলোর উপর আমল করতে পারাকে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করবে। কারণ এতে অনেক বরকত ও কল্যাণ নিহিত আছে।

কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল নিম্নরূপ

(১) তাহাজ্জুদ নামায, (১২ রাকাত, কমপক্ষে ৪ রাকাত) উত্তম হলো, শেষ রাতে পড়া। তবে যত দিন শেষ রাতে উঠার অভ্যাস না হয়, ততদিন ইশা নামাযের ফরজ এবং বেতের নামাযের মাঝে ৪ রাকাত নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়বে। তবে মনোভাব এই রাখবে যে, শেষ রাতেই পড়ার চেষ্টা করবো।

(২) তাহাজ্জুদ নামাযের পর, আর যদি সে সময় কষ্ট হয়, তাহলে ফজর নামাযের পর 'বারো তাছবীহ' পাঠ করবে। 'বারো তাছবীহ' বলা হয়, لا اله الا الله দুইশতবার, الا الله চারশতবার, الله الله (এইভাবে যে, প্রথম الله শব্দের হা'র মধ্যে পেশ দিয়ে দ্বিতীয় الله শব্দের হা'র মধ্যে জযম দিয়ে পড়বে) ছয়শতবার, শুধুমাত্র الله একশতবার। মোট যদিও তের তাছবীহ অর্থাৎ তেরশতবার হয়, তবুও এটা 'বারো তাছবীহ' নামে প্রসিদ্ধ।

(৩) ইশরাক নামায, চাশ্‌ত নামায, আওয়াবীন নামায, আসর ও ইশার পূর্বে চার রাকাত করে নফল নামায আদায় করবে।

(৪) নিজের সুবিধামতো দিনের কোন এক সময় সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুজ্জাম্মিল তেলাওয়াত করবে।

(৫) জুমার দিনে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে।

(৬) সপ্তাহে একদিন 'সালাতুত্ তাস্‌বীহ' পড়বে।

(৭) ফজর নামাযের সুন্নাত এবং ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে শুরু এবং শেষে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এই আমলটি 'পরশ পাথর' তুল্য, নিয়মিত আমল করলে

অসংখ্য সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন এর উপর নিয়মিত আমল করে থাকেন। যদি সুন্নাত আর ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে ফজর নামাজের পর পাঠ করে বুকে ফুঁক দিবে।

সতর্কবাণী

উপরে যে সকল আমলের কথা বলা হলো, এর উপর নিয়মিত আমল করার সাথে সাথে এ কথাটিও খুব ভালভাবে মস্তিষ্কে বসিয়ে নিবে যে, যিকির ও অযীফা আসল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করা। আর এর জন্য শর্ত হলো, 'তাকওয়া' অবলম্বন করা। আর 'তাকওয়া' লাভ হয়, আত্মার ময়লা দূরীকরণ ও গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে। এর জন্যই সকল মুজাহাদা (সাধনা) করা হয়। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, ওয়াজিব হকসমূহ আদায় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়া, সামাজিকতার ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও আড়ম্বরহীনতা, ব্যবহারে নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এ সকল জিনিসের প্রতি গুরুত্বারোপ করা ব্যতীত সুলূকের পথে তথা আল্লাহ প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। বরং আসল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যিকির ও অযীফাকেই সব কিছু মনে করে বসে থাকবে না। বরং নিজের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে। 'আত্মশুদ্ধির' ফিকির মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ত্যাগ করবে না। কেননা নফসের কলুষতা ও ময়লা অনেক সময় দীর্ঘদিনেও ধরা পড়ে না। চোখ, কান ও যবানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা এই তিনটি অঙ্গই সকল ইবাদাতের উৎস স্থল এবং সকল গোনাহেরও মূল সহায়ক।

এই তিনটি অঙ্গই সকল বাতেনী আমলের (চাই তা গুণাবলীর তথা ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হোক কিংবা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হোক) চালিকা শক্তি। এ কারণেই এ সকল অঙ্গের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অর্থাৎ, এগুলো

ব্যবহারের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। যদি কখনও কোন ভুল হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তাওবা করে নিবে। কবি বলেনঃ

چشم بند و گوش بند و لب به بند
گر نه بینی نور حق بر من بخند

অর্থাৎ, তুমি চোখ, কান ও ঠোট তথা যবানকে নিয়ন্ত্রণ করো, এতেও যদি আল্লাহ্‌র নূর দেখতে না পাও তাহলে, আমাকে তিরস্কার করো।

যিকির-আযকার ও অযীফার ক্ষেত্রে অবকাশ ও ব্যস্ততা, সুস্থতা ও অসুস্থতা হিসেবে কম-বেশী করা যায়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা ও পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিকতা ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা এবং চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা সর্বাবস্থায় জরুরী।

উপরোক্ত আমলসমূহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার মাধ্যম হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে যত বেশী যত্নবান হবে, আল্লাহপাকের নৈকট্যও ততবেশী লাভ হবে। আর এতে যত ক্রটি ও অলসতা দেখা দিবে, তত বেশী ব্যর্থতা গ্রাস করবে। কাজেই খুব গুরুত্বের সাথে নিজ জীবনকে সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণের ছাঁচে ঢেলে নিবে। চাই সেটা ইবাদতগত বা অভ্যাসগত যে কোন ধরনের সুন্নাতই হোক না কেন। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হোক কিংবা দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, বসবাস করা, পানাহার করা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আকৃতি-প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করা চাই। (এ সকল বিষয়ের সুন্নাতের বিস্তারিত আলোচনা 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামক কিতাব এবং 'দৈনন্দিন কাজে প্রিয় নবীর (সাঃ) প্রিয় সুন্নাত' নামক বইতে করা হয়েছে) সুন্নাত এমন এক পবিত্র জিনিস যার মধ্যে নফস এবং শয়তানের কোন দখল নেই। যদি কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

অনুসরণ করার তাওফীক হয়ে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তা'আলা আল্লাহ্‌র নিকট সেটাও গ্রহণযোগ্য এবং প্রিয় হবে।

নিয়তঃ উপরোক্ত সকল যিকির ও অযীফার মধ্যে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের নিয়ত করতে হবে। কারণ, চাই বাহ্যিক আমল হোক কিংবা আভ্যন্তরীণ, সবকিছুর জন্য একজন মুমিনের এই নিয়তই মাপকাঠি। নিয়ত যে পরিমাণ সহীহ এবং মজবুত হবে, সেই পরিমাণ ফলাফল ও বরকত লাভ হবে।

মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বাতেনী আমল

পূর্বে যে সকল আমলের কথা বলা হয়েছে, তা সবই জাহেরী আমল। কিন্তু আত্মশুদ্ধির জন্য এগুলো খুবই উপকারী। এখন (বিশেষ কিছু) বাতেনী আমলের কথা বলা হচ্ছে। যে সকল বাতেনী আমল হাসিল করা দরকার, তা সংখ্যায় অনেক এবং সেগুলো কোন কামেল পীরের সান্নিধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাসিল করা আবশ্যক। কিন্তু আমি সেগুলোর মধ্য হতে এমন চারটি আমলের কথা বলবো, যা ফরয ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত এবং জাহেরী আমল সহ পূর্ণ তাছাওউফ তথা সমগ্র দ্বীনের বুনিয়াদ এবং প্রাণ শক্তি। আমল হিসেবে এগুলো খুবই সহজ এবং বরকতপূর্ণ। এটা অবশ্য আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত যে, ঐ আমলের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় বা শর্ত নেই। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সর্বাবস্থায় এ সকল আমল করা যায়। অবশ্য অভ্যাস করে নিতে হবে। ইনশাআল্লাহ্! উপরোক্ত আমলসমূহকে অভ্যাসে পরিণত করে নিয়মিত আদায় করলে, আত্মার অনেক রোগ নিজেই দুর্বল হয়ে যাবে এবং নেক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে শক্তিশালী হবে। সেই চারটি আমল নিম্নরূপ।

(১) শোকর (কৃতজ্ঞতা)।

(২) সবর (ধৈর্য)।

(৩) ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)।

(৪) ইস্তি'আযাহ (আশ্রয় চাওয়া)।

(১) শোকর

সর্বাগ্রে এই ব্যবস্থা নিবে যে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা ও চারপাশের পরিবেশের উপর দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহপাকের দেওয়া দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামতের কথা চিন্তা করে সংক্ষিপ্তভাবে শোকরিয়া আদায় করবে। বিশেষ করে ঈমান ও সুস্থতা লাভ হওয়ার প্রতি আন্তরিকভাবে শোকরিয়া আদায় করে এ সকল নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার প্রতিজ্ঞা করুন।

এগুলো ব্যতীত অন্য যে নেয়ামতের কথাই মনে আসে, মনে মনে তার শোকরিয়া আদায় করবে। (মুখে বলবে)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা এবং আপনার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।

অর্থাৎ, কোন কিছু মনমতো হলে, কোন দু'আ কবুল হলে, কোন কথায় মনে আনন্দ লাভ হলে, কোন কিছু পছন্দনীয় হলে, কোন ভাল কাজের তাওফীক হলে, মনে মনে আল্লাহপাকের শোকরিয়া আদায় করে নিবে। আল্লাহ না করুন, কোন সময় যদি কষ্টের বা পেরেশানীর কোন কারণ দেখা দেয়, তাহলে সেটা দূর হওয়ার পূর্বে এদিকে মনোযোগ দিবে যে, আল্লাহপাক কোন প্রকার যোগ্যতা ছাড়াই আশেপাশে কত নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। যদি এগুলো না হতো তাহলে এই দুঃখ-বেদনা ও পেরেশানীর অবস্থা আরো কত ভয়াবহ হতো! এগুলো হৃদয়কে মজবুত রাখার উপকরণ। এই মুরাকাবার দ্বারা স্বাভাবিক ও শারীরিক দুঃখ-কষ্ট দূর না হলেও যৌক্তিক কারণে হৃদয়ের কষ্ট দূর হয়ে আত্মিক প্রশান্তি লাভ হবে। কারণ আল্লাহপাকের অসংখ্য নেয়ামত সর্বক্ষণ আমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই সকল নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা হয়ে যাবে। এভাবে শোকর আদায়ের অভ্যাস করার ফলে মানুষ শোকরে এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, ভাল কোন কিছু হলেই মনে মনে শোকর আদায় করে নেয়। অন্য কেউ জানতেও পারে না। অথচ সে এক বিরাট ইবাদাত আঞ্জাম দিতে থাকে। এ কাজে

আল্লাহপাকের নিকট যে মর্তবা লাভ হয়, সেটা কল্পনাও করা যায় না। মোটকথা! মানুষের এমন হওয়া উচিত যে, সে যেমন অবস্থায়ই থাকুক না কেন; সর্বাবস্থায় শোকর আদায় করবে। প্রথম দিকে এ কাজটি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু অভ্যাস করলে এবং অধিকাংশ সময় এদিকে খেয়াল রাখলে এই কাজ সহজ হয়ে যায় এবং এটা অভ্যাসে পরিণত হয়।

শোকর এমন একটি আমল, দ্বীনের প্রতিটি শাখায় যার চাহিদা আছে এবং এতে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য সীমাহীন বরকত দানের ওয়াদা রয়েছে। এই আমলের দ্বারা আল্লাহপাকের মুহাব্বাত লাভ হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়। নিজের অবস্থায় قناعت (অল্পে তুষ্টির) এর স্বাদ উপভোগ করা যায়। এতে জীবন নিরাপদ হয়। এটাও শোকরেরই ফল যে, শোকরগুজার ব্যক্তির গোনাহ খুবই কম হয়। অহংকার, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, অপব্যয়, কৃপণতা ইত্যাদির ন্যায় মারাত্মক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(২) সবর-(ধৈর্য)

সবর এমন একটি বাতেনী আমল, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন এবং এটা হাসিল করার জন্য অনেক বেশী মুজাহাদার প্রয়োজন হয়। সবরের মধ্যে আল্লাহপাকের পক্ষ হতে ঈমানী শক্তির পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই জীবনে দিবা-রাত্রির মধ্যে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর এবং অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে। কখনো নিজের কিংবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের অসুখ, দুঃখ-কষ্ট বা মৃত্যুর বেদনা সহ্য করতে হয়। আবার কখনো আর্থিক বা পদের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কষ্ট সহ্য করতে হয়। আবার কখনো নিজ মনের সংশয় পেরেশান করে থাকে। মোটকথা এমন সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে যা মানুষের আত্মার প্রশান্তিকে বিনষ্ট করে, ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু যেহেতু এ সকল দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসীবত ইচ্ছাধীন নয় এবং মানুষের আয়ত্ত্বেও নয়, সেহেতু এসব কিছু

আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে হওয়ার বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। কেননা এ সবের পিছনে অনেক হিকমত ও রহমত নিহিত আছে। এ ধরনের (ভয়াবহ) পরিস্থিতিতে আত্মাকে প্রশান্ত রাখার জন্য আল্লাহপাক স্বীয় রহমতে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ঔষধ দান করেছেন। আর সেই ঔষধ হলো, বিপদ-আপদে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করতে থাকা।

درد از یارست ودرما نیزهم

دل فدائے اوشد وجان نیزهم

نیم جان بستاند وصدجان دهد

انچه در وهمت نیاید آن دهد

অর্থাৎ, দুঃখ-বেদনা ও তার উপশম সবই আল্লাহপাকের পক্ষ হতে। কাজেই জান-প্রাণ সবই তার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমরা অর্ধ প্রাণ দিলে তিনি শত জীবন দান করে থাকেন। আমাদের ধারণায়ও আসে না সেটাও তিনি দান করে থাকেন।

এ আমলের দ্বারা হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং সহ্য করার শক্তি লাভ হয়। মোটকথা! ছোট বড় সর্ব প্রকার দুঃখ-বেদনার মুহূর্তে অধিক পরিমাণে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করবে। এরূপও বর্ণিত আছে যে, দুঃখজনক কোন অতীত ঘটনার কথা স্মরণ হলেও اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করবে। এতে ঘটনা সংঘটনের মুহূর্তে পড়লে যে পরিমাণ ছওয়াব হতো, এখনও সেই পরিমাণ ছওয়াব লাভ হবে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য কষ্টকেও মুসীবত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি সাময়িকভাবে বাতি নিভে গেলেও اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়েছেন। কারণ, যারা এই দু'আ পড়ে তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নিরাপত্তা ও রহমতের ওয়াদা আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ, তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা ১৫৭ আঃ)

সবর এমন একটি আমল, যা পালনকারী সম্পর্কে আল্লাহর সান্নিধ্যের ওয়াদা রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা ১৫৩ আঃ)

পূর্বোক্ত আয়াতে ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিশেষ রহমত নাযিল হওয়া এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ আমল দ্বারা মানুষের মাঝে দৃঢ়তা, মজবুতী, গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনা ইত্যাদি মোকাবেলা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আর স্বয়ং আল্লাহপাকের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মতো যোগ্যতা অর্জন করা ধৈর্যের সবচেয়ে বড় লাভ। ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে কখনো কারো থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার মতো ক্রোধ এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয় না।

(৩) ইস্তিগফার

তৃতীয় আমল হলো, ইস্তিগফার। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাতেনী আমল। এই আমল করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়ের প্রয়োজন নেই। অবশ্য এই আমলটি সব সময়ই করা উচিত। মানুষের অন্তরে কত বিচিত্র ধরনের গোনাহের চাহিদা এবং ভ্রান্ত চিন্তার উদয় হতে থাকে। কত ধরনের গোনাহ প্রতিদিন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হতে থাকে। কোন কোন গোনাহতো এমনও আছে যে, সেগুলোর অনুভূতিও আমাদের নেই, অথবা সেগুলোকে আমরা গোনাহই মনে করি না। এ সকল অবস্থায় যখনই হুশ হয়, সাথে সাথে মনে মনে অত্যন্ত অনুশোচনা ও অনুতাপের সাথে আল্লাহপাকের দিকে নিজ চিন্তা-চেতনাকে ফিরিয়ে আনবে এবং মুখে বলবে ঃ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ হে আল্লাহ! আমি অত্যন্ত লজ্জিত, আমাকে মাফ করুন এবং ভবিষ্যতে এই পাপ থেকে রক্ষা করুন। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ

হে আমার রব! আমাকে মাফ করুন, আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কেননা আপনিই সর্বোত্তম রহমত বর্ষণকারী।

ইস্তিগফার এমন একটি আমল, যে আমল করার ফলে বান্দা আল্লাহপাকের পক্ষ হতে পরিপূর্ণ ক্ষমা ও অসীম রহমত লাভ করে থাকে। এতে আত্মিক অনুতাপের সাথে সাথে দাসত্বের অনুভূতিও জাগ্রত হয়, ঈমানের হেফাজত হয়, 'তাকওয়ার' মতো অমূল্য সম্পদ লাভ হয়। এমন ব্যক্তির দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক গোনাহ হয় না। আল্লাহর সৃষ্টিকূলও তার দ্বারা কষ্ট পায় না। আল্লাহপাক কেবলমাত্র নিজ দয়া ও রহমতে নিজের গোনাহগার অক্ষম বান্দাকে দুনিয়ায় সফলতা ও আখেরাতে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে তাওবা ও ইস্তিগফারের অসীলা দিয়ে অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। فلله الحمد والشكر

মাশায়েখগণ ও বুযুর্গানে দ্বীন ইরশাদ করেছেন, বিগত জীবনের সকল গোনাহের কথা স্মরণ করে (চাই ছগীরাহ গোনাহ হোক বা কবীরা গোনাহ) দু' চারবার অত্যন্ত অনুতাপ ও মনভরে কান্নাকাটি করে তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেওয়া যথেষ্ট। এতে ইনশাআল্লাহ সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে পুনরায় কখনো ঐ সকল গোনাহকে স্মরণ করে পেরেশান হবে না। তবে যদি কোন অতীত গোনাহ এমনিতেই স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে মনে মনে ইস্তিগফার করে নিবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় বান্দার হক যেভাবেই হোক, যথাসম্ভব আদায় করা অথবা মাফ করিয়ে নেওয়া (কখনো) ফরজ এবং (কখনো) ওয়াজিব।

(৪) ইস্তি'আযাহ (আশ্রয় প্রার্থনা করা)

চতুর্থ আমল, ইস্তি'আযাহ্। অর্থাৎ, আল্লাহপাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কারণ (আমাদের) জীবন দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদে আবর্তিত। সব সময় নফস এবং শয়তানের মুকাবিলা করতে হয়। কাজেই সব সময় এ সকলের আক্রমণ থেকে আল্লাহপাকের আশ্রয় কামনা করতে হবে। লেন-দেন এবং মানুষের সাথে চলা-ফেরা ও সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে অধিকাংশ সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, ভবিষ্যতের জন্য

অনেক কিছুর আশংকা সৃষ্টি হয় এবং তা দূর করার কোন উপায় ও তাদবীর বুঝে আসে না। আবার কোন কোন সময় তাদবীর নিজের সাধ্যের বাহিরে চলে যায়। এসকল অবস্থায় স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহপাকের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করা স্বভাবতঃই হৃদয়কে শক্তি জোগায়।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ

অর্থাৎ, আল্লাহপাকের সাহায্য ব্যতীত কোন পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয় এবং কোন ছওয়াবের কাজ করারও শক্তি লাভ হয় না। আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির এবং আশ্রয়ের কোন জায়গা নেই, আল্লাহ ব্যতীত। যেমন, দ্বীন অথবা দুনিয়ার কোন ব্যাপারে মারাত্মক কোন ক্ষতির আশংকা হলো অথবা আর্থিক ক্ষতির কোন সম্ভাবনা দেখা দিলো, কিংবা কোন রোগ-শোক বা উপার্জনের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা দেখা দিলো অথবা কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার আশংকা হলো অথবা কোন শত্রু বিদ্বেষী কর্তৃক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জান অথবা মালের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলো অথবা নফ্স বা শয়তানের প্ররোচনায় কোন বাহ্যিক বা আত্মিক গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলো অথবা আখিরাতে জিজ্ঞাসিত হওয়ার আশংকা হলো অথবা কোন ঘৃণ্য খেয়াল অন্তরে জাগ্রত হলো, এ সকল অবস্থায় সাথে সাথে মনে মনে আল্লাহপাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহপাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কয়েকবার ইস্তিগফার পড়বে, দুরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং নিম্নে বর্ণিত দু'আসমূহ হতে কোন একটি পাঠ করবে।

(১) اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে হেফাজত করুন।

(২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার দয়া (ভিক্ষা) চাই।

(৩) اَللّٰهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুস্থতা দান করুন এবং ক্ষমা করুন।

(৪) يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

অর্থাৎ, হে حى (চীরঞ্জীব) হে قيوم (চীর প্রতিষ্ঠিত) আপনার রহমত (ভিক্ষা) চাই।

উত্তম হলো সকালে অযীফা পাঠ করে নিম্নে বর্ণিত পন্থায় দু'আ করে নিবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আমাকে এবং আমার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে সর্বপ্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পেরেশানী থেকে হেফাজত করুন। সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার, নগ্নতা ও বেহায়াপনা থেকে এবং নফ্স ও শয়তানের ধোঁকা থেকে, আসমানী ও জমিনী বালা-মুসীবত ও দুর্ঘটনা থেকে, সর্বপ্রকার দুরাবস্থা ও অসুস্থতা থেকে, অন্য মানুষ কর্তৃক কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করে আপনার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দান করুন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَمِيْعِ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ - وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِّالْعِبَادِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই নিজ নফ্সের অনিষ্টতা এবং স্বীয় পাপ কর্ম থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার জাহেরী এবং বাতেনী ফেতনা হতে। আমি আশ্রয় চাই, আল্লাহপাকের সকল পরিপূর্ণ কালিমার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে। আমি আমার সকল বিষয় আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তিনি বান্দাকে খুব পর্যবেক্ষণ করেন।

এটা এমন একটা আমল যার দ্বারা বান্দা আল্লাহপাকের বড়ত্ব, প্রভুত্বের শান ও রহমত প্রত্যক্ষ করে থাকে। এরূপ ব্যক্তির অন্তরকে

আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে হেফাজত করা হয় এবং তাঁকে আত্মার প্রশান্তি দান করা হয়। তাওয়াক্কুল এবং নিজকে আল্লাহ্র নিকট সঁপে দেওয়ার মানসিকতা লাভ হয়। এরূপ ব্যক্তি কারো ক্ষতি করে না। কখনো যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় এবং তা দূর করার উপায় বুঝে না আসে, তাহলে এক্ষেত্রে হযরত থানভী (রহঃ)-এর পরামর্শ হলো, মনে মনে দু'আ করা। ইনশাআল্লাহ এর ফলে দুশ্চিন্তা দূর হবে, প্রশান্তি লাভ হবে, কাজ সহজ হবে।

হাকীকত এই যে, উপরোক্ত চারটি বিষয়ই এমন গুরুত্বপূর্ণ আমল যে, যখন এর মধ্য হতে কোন একটি আমল করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং আমল শুরু করা হয়, তৎক্ষণাৎ মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহপাকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার তাওফীক হয়ে যায়। কাজেই এ সকল আমল আল্লাহপাকের অফুরন্ত নিয়ামত।

উপরোক্ত চারটি আমলের নিয়ত পূর্ব থেকেই করে নিবে এবং মাঝে মাঝে এই নিয়তের নবায়ন করবে। কারণ এই আমলগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও করেছেন এবং অন্যদেরকে এব্যাপারে তাকীদ করেছেন। সুতরাং সুন্নাতের অনুসরণের বদৌলতে ইনশাআল্লাহ এগুলো আল্লাহপাকের দরবারে কবুল হবে এবং পছন্দনীয় হবে।

এই চারটি আমলের সংক্ষিপ্ত চিত্র দৈনন্দিন আমলের মধ্যে এভাবে শামিল করা যেতে পারে

(১) অতীতের জন্যঃ সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গোনাহের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত অনুশোচনার সাথে মন ভরে কান্নাকাটি করে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। বিগত দিনের ছুটে যাওয়া ফরজ ও ওয়াজিবের ক্ষতিপূরণ গুরুত্বের সাথে করবে। আল্লাহপাকের দরবারে আমলসমূহ কবুল হওয়ার জন্য এবং গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করবে।

(২) বর্তমানের জন্যঃ (ক) আল্লাহপাকের দেওয়া বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে শোকর আদায়

করবে এবং ঐ সকল নেয়ামতকে সহীহভাবে ব্যবহার করার পণ করবে। সাথে সাথে পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যও দু'আ করবে।

(খ) বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশাকে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে আগত এবং তাঁর (সতর্ককারী এক ধরনের) রহমত মনে করে ধৈর্য ধারণ করবে। আল্লাহপাকের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারার জন্য, ধৈর্য শক্তি দানের জন্য এবং আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে দু'আ করবে।

(৩) ভবিষ্যতের জন্যঃ জীবনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে, দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ঘটনা থেকে, দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে, নফস ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে, ভোগ-বিলাসজনিত গাফলত থেকে, আশংকা ও বিপদ থেকে, আল্লাহপাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা এবং ঈমানের সাথে মউতের জন্য দু'আ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এই সংক্ষিপ্ত আমলই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যথেষ্ট হবে। উপরোক্ত বিষয়াবলীর উপর আমল করার হুকুম ও ফযীলত কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আছে।

সালেকের সমস্যা

উপরোক্ত বিষয়াবলী ব্যতীত আরো কিছু বিষয় এমন আছে, যা অধিকাংশ সালেকের জন্য সমস্যারূপে দেখা দেয়, সেগুলো সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

বিশেষভাবে যে সকল লোক অধিক পরিমাণে যিকির করে তাদের অন্তরে, আর কোন কোন সময় সাধারণ দ্বীনদার লোকদের অন্তরে অনিচ্ছাকৃতভাবে قبض ও بسط (ভগ্নোৎসাহ ও প্রফুল্লতা) এর অবস্থা বিরাজ করে। যদিও এ অবস্থাটা অস্থায়ী, কিন্তু আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এর কারণে রূহানী এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়।

(১) قبض বা ভগ্নোৎসাহঃ এই অবস্থায় অন্তরে ঘন অন্ধকার ও সংকুচিত ভাব প্রাধান্য পায়। নিজের সকল আমল এমনকি সম্পর্ক ও

লেন-দেন, আচার-ব্যবহার সব কিছুই অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়। নৈরাশ্য ও অপ্রকৃতিস্থতার কারণে জীবন দুঃসহ মনে হয়। কোন কোন সময় ঈমান ও নাজাতের বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা সত্ত্বেও ফরজ-ওয়াজিব আদায় হতে থাকে। এ সময় অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার, দুরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং আল্লাহপাকের নিকট আশ্রয় ও সুস্বাস্থ্য কামনা করবে। قبض বা ভগ্নোৎসাহের এ অবস্থাটি নিতান্তই অস্থায়ী হয়ে থাকে। তবে এতে অন্তরের অসংখ্য উপকারিতা নিহিত আছে। কারণ এতে নিজের অক্ষমতা, অসহায়তা, অপারগতা এবং দাসত্ব ও ধ্বংসের অনুভূতি তীব্র হয়ে থাকে। এটা সালেকের জন্য ধৈর্যের বা সবরের মাকাম। এতে আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভ হয়। নিজ ইলম ও আমলের যোগ্যতার ভ্রান্ত ধারণা থেকে সৃষ্ট অহংকার ও আত্মশ্লাঘার মূলোৎপাটন হয়ে থাকে।

(২) **بسط বা প্রফুল্লতাঃ** পক্ষান্তরে যে সকল লোক যিকির-আযকার ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন, কোন কোন সময় তাদের অন্তরে আনন্দ-প্রফুল্লতা ও উৎসাহের ভাব বিরাজ করে। এ অবস্থায় ইবাদত-বন্দেগীতে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও লিপ্ততা বেড়ে যায়। নিজের আশে-পাশে সর্বক্ষণ আল্লাহপাকের নিয়ামতসমূহ এবং দয়ার চিত্র প্রত্যক্ষ করতে থাকে। মনের মধ্যে আনন্দের ঘোর বিরাজ করতে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের আধ্যাত্মিক নূর ও দ্যুতিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ থাকে। যদিও এটি একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা, তা সত্ত্বেও আল্লাহর পথের পথিকগণ এ অবস্থায় শোকরের মাকামে অবস্থান করে এবং আল্লাহপাকের মুহাব্বতে পরিতৃপ্ত থাকে।

তবে এক্ষেত্রে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, قبض ও بسط (ভগ্নোৎসাহ ও প্রফুল্লতা) এর অবস্থা একান্তই অস্থায়ী ও ক্ষমতা বহির্ভূত। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হলো, এতে প্রভাবিত না হওয়া। বরং সর্বাবস্থায় ফরজ-ওয়াজিব আদায়ে ব্যস্ত থাকা উচিত। কারণ জীবনের উদ্দেশ্য এটাই।

মোটকথা! মন প্রফুল্ল থাকা বা ব্যথিত হওয়ার (قبض و بسط) –এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, নিজ দায়িত্ব (ফরজ ওয়াজিব) পালনে লিপ্ত থাকবে। কারণ মানুষের মনের অবস্থা সর্বক্ষণই পরিবর্তন হতে থাকে। এ পরিবর্তনের হাত থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। প্রকৃত পক্ষে মনের এই পরিবর্তনই মানুষের আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন এবং আধ্যাত্মিক মর্তবা লাভের কারণ হয়ে থাকে। কাজেই মনের যখন যে অবস্থা হোক, সে অবস্থায় তার হক আদায় করতে হবে। কখনো সবর (ধৈর্য ধারণ) করতে হবে, আবার কখনো আল্লাহপাকের শোকর আদায় করতে হবে। কিন্তু নিজের পক্ষ হতে কোন হালাত প্রতিরোধ বা অর্জনের পরিকল্পনা করা উচিত নয়। নিজের সকল ব্যাপার আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দিবে। এটাই নিরাপদ ও স্বস্তির জীবন লাভের উপায়। এ কথাটি ভালমতো বুঝে নেওয়া দরকার যে, উত্তম আমল ও প্রসংশনীয় অবস্থার উপর অহংকার ও গর্ব করা শোভনীয় নয় এবং অসম্পূর্ণ অবস্থার দরুণ নিরাশ হওয়ারও প্রয়োজন নেই। অহংকার করা কিংবা নৈরাশ্যের শিকার হওয়া, উভয়ই আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য 'ডাকাত' স্বরূপ। আসল মাপকাঠি হলো, আল্লাহপাকের নিকট কবুল হওয়া এবং শরী'অতের হুকুম পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা ও গোনাহ থেকে সার্বিকভাবে বেঁচে থাকা।

অধিক পরিমাণে যিকির এবং নিয়মিত নেক আমল করার দ্বারা যখন অবস্থা ও আমলের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়, তখন যোগ্যতা, ইলম ও বোধশক্তি অনুপাতে আল্লাহপাকের সাথে 'বাতেনী নিসবত' (আধ্যাত্মিক সম্পর্ক) লাভ হয়। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই ইবাদত-বন্দেগীর মুহাব্বত ও আগ্রহ এবং কুফর ও গোনাহের প্রতি ঘৃণা পয়দা হয়। কোন কোন সময় কতিপয় আধ্যাত্মিক বিষয়ের হাকীকত এবং রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে। এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাকে কোন প্রকার যোগ্যতা ছাড়াই দান করা হয়ে থাকে, যা নিছক আল্লাহপাকের নিয়ামত ও অনুগ্রহ। কাজেই সর্বদা আল্লাহপাকের শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

এ ব্যাপারে আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, যিকির ও নামাযরত অবস্থায়, এছাড়া অন্যান্য সময়ও অধিক পরিমাণে মন ও

মস্তিষ্কে ভ্রান্ত ও অহেতুক কল্পনা ও খেয়াল জাগ্রত হয়, মারাত্মক ধরনের সংশয় ও আশংকা মস্তিষ্কে ভীড় করতে থাকে। কোন কোন সময় কুফর এবং ধর্মহীনতার আশংকাও দেখা দেয়। দ্বীন ইসলাম ও আখেরাতের বিষয়াবলী সম্পর্কে অন্তরে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কোন কোন সময় কু-প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কোন কোন সময় নিজ আমলের দুরাবস্থা ও দুনিয়ার বিষয়ে ব্যর্থতার দরুণ মারাত্মক পর্যায়ের নৈরাশ্যে অন্তর ছেয়ে যায়। এ ব্যাপারে খুব ভালমতো মনে রাখতে হবে যে, এগুলোর কোনটিই ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, বরং শয়তানের কারসাজী। এ সকল অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত না (প্রবৃত্তির) চাহিদার উপর আমল করা হবে, সে সময় পর্যন্ত এটা অপরাধ হিসেবে ধর্তব্য হবে না এবং এটা বঞ্চিত হওয়ার চিহ্নও নয়। এতে ঈমানেরও কোন ক্ষতি হয় না। এতে আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোন পার্থক্য হয় না। বরং এ সকল ব্যাপার অপছন্দনীয় এবং কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে ইহা সহ্য করার দরুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। এ সময়ে মনোযোগ অন্য দিকে আবদ্ধ রাখবে অথবা কোন দ্বীনী কিতাব পাঠ করবে অথবা কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সান্নিধ্যে গিয়ে বসবে। কয়েকবার ইস্তিগফার এবং ইস্তি'আযাহ পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ এ সকল আমলের বরকতে ধীরে ধীরে সংশয়-সন্দেহ এবং ওয়াস্ওয়াসাহ্ থেকে মুক্তি লাভ হবে। যদি সারা জীবন এ থেকে মুক্তি লাভ নাও হয়, তবুও এতে দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এগুলো ইচ্ছাধীন না হওয়ার কারণে শাস্তিযোগ্য নয়।

উপরোক্ত আলোচনায় তাছওউফ এবং সুলূক তথা আল্লাহ প্রাপ্তির পথের সকল মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহ বিবৃত হয়েছে। প্রকৃত মজবুত ঈমান, আত্মিক খোদাভীতি ও তাকওয়া এবং মা'রেফাতে নফ্স (আত্মার পরিচয়) লাভের এগুলোই হলো মূলধন। উপরে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে বেশী অযীফার আশা এখন করার প্রয়োজন নেই। এটি এমন এক তরীকা যাতে বঞ্চিত হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। ইনশাআল্লাহ এই সংক্ষিপ্ত আমলের দ্বারাই সব কিছু অর্জন করা যাবে। তবে এজন্য নিয়ত খালেছ হওয়া এবং আমল স্থায়ী হওয়া শর্ত। কেননা বলা হয়ে

থাকেঃ الاستقامة فوق الكرامة। অর্থাৎ, আমলের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে স্থায়ীভাবে আমল করতে পারা, এটা কারামতের চেয়ে বড়।

সারাংশ

সর্বপ্রকার মুজাহাদা, (সাধনা) যিকির-আযকার, চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য আল্লাহ্পাকের বিধানের (করণীয় ও বর্জনীয়) উপর আমল করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ নিঃসঙ্কোচে করার অভ্যাস গড়া। যাতে আল্লাহর হক, নিজের নফ্সের হক, বান্দার হক শরী'অতের হুকুম মুতাবিক পূর্ণরূপে সহজে আদায় করা যায়। কারণ এর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতে হায়াতে তাইয়্যেবা (পবিত্র জীবন) লাভের উপায় নিহিত আছে।

বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাতা-পিতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক এবং মুসলমানদের হক আদায় করার জন্য শরী'অত কর্তৃক আমরা আদিষ্ট। কাজেই একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের হক কোন প্রকার প্রতিদান পাওয়ার লোভ না করে, অত্যন্ত উদারতা ও নম্রতার সাথে আদায় করবে এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। যথাসম্ভব চেষ্টা করবে তোমার ব্যক্তি সত্ত্বা থেকে কেউ যেন সামান্য কষ্টও না পায়।

کبھی بھول کر کسی سے سلوک نہ کرو ایسا

کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا

অর্থাৎ, ভুলেও কারো সাথে এমন ব্যবহার কভু করো নাকো তুমি,
যে ব্যবহার তোমার সাথে করলে কেহ্ কষ্ট পাও তুমি।

নিজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে যদি কোন ব্যাপারে ত্রুটি হয়ে যায়, কিংবা তারা কেউ ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করে, তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিবে এবং ক্ষমা করে দিবে। আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটাই হুকুম। সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে দ্বীনের তাবলীগ করতে থাকবে। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। কারণ এটা আল্লাহর হুকুম এবং আমাদের উপর ওয়াজিব।

জরুরী হেদায়েত

আলহামদুলিল্লাহ! উপরোল্লেখিত কার্যসূচী আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য বিশেষ করে সুস্থ প্রকৃতির লোকদের জন্য অধিকাংশ সময় ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট ও অত্যন্ত উপকারী হবে। তবে আমি শুরুতেই বলেছি মানুষের স্বভাবে এমন কিছু গুপ্ত দোষ থাকে, যা বাহ্যিক আমলের উপরও প্রভাব ফেলে থাকে এবং তার দৈনন্দিন কার্য-কলাপকে পর্যুদস্ত করে দেয়। এর মধ্যে কিছু কিছু দোষ খুবই মজবুত হয়ে থাকে, যা কঠোর মুজাহাদা ও সাধনা ব্যতীত সংশোধন হয় না। যেমন, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, পদের মোহ, সম্পদের মোহ, ক্রোধ, গীবত, কু-দৃষ্টি, অবৈধ যৌন চাহিদা ইত্যাদি। এ সকল আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য পীর-মাশায়েখ তথা আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। নিয়মিত চিকিৎসা ও রূহানী তা'লীম তারবিয়্যত ব্যতীত এ সকল জিনিসকে নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত কঠিন। যেমন, কবি বলেছেনঃ

نفس نتوان کشت الا ظل پیر

অর্থাৎ, নফ্স (প্রবৃত্তি)কে নিয়ন্ত্রিত করা পীরের ছায়া ব্যতীত সম্ভব নয়।

এজন্যই আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কামেল পীরের রাহনুমায়ীকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়।

যোগ্য ও কামেল লোকের প্রচন্ড অভাবের এ যুগে যদি শরী'অতের ও সুন্নাতের অনুসারী পীর পাওয়া না যায়, তাহলে 'তারবিয়াতুস্ সালেক' [কৃত হযরত থানভী (রহঃ)] এবং "বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত" (কৃত হযরত আরেফী (রহঃ)] নামক কিতাবদ্বয় অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করবে। কারণ 'তারবিয়াতুস্ সালেক' নামক কিতাবে হযরত থানভী (রহঃ) উপরে বর্ণিত আত্মার এ ধরনের মারাত্মক রোগসমূহের পরিক্ষিত ও অত্যন্ত উপকারী চিকিৎসাসমূহ বিস্তারিভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সকল চিকিৎসা ও ব্যবস্থার উপর আমল করে হাজার হাজার আধ্যাত্মিক রোগের রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন। ইনশাআল্লাহ এই ব্যবস্থা পত্রের উপর আমল করলে কখনো বঞ্চিত হবে না।

যদি কেউ উপরোক্ত কিতাবদ্বয় সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে, নিম্নোক্ত তাদবীরসমূহের উপর আমল করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আধ্যাত্মিক রোগ থেকে মুক্তি পাবে। এটা হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) কর্তৃক প্রণয়নকৃত আমল।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেনঃ কারো যদি কোন বুযুর্গের সাথেই মিল না হয় এবং মিলের আশাও না থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্যও আমি একটি পথ বের করেছি। যেহেতু এটা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের পথ, তাই এ থেকে কেউই বঞ্চিত থাকবে না। **পথটি এই যে,**

(১) আল্লাহ পাকের জরুরী আহকামের ইলম হাসিল করতে হবে। সেটা কিতাব পড়েও হতে পারে, উলামায়ে কিরামের নিকট জিজ্ঞাসা করেও হতে পারে।

(২) সাদাসিধেভাবে নামায-রোযা আদায় করবে।

(৩) তোমার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক রোগ তুমি অনুভব করে থাক, সেগুলোর চিকিৎসা নিজের বুঝ অনুযায়ী নিজেই করতে থাকবে।

(৪) বড় বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

(৫) অন্যান্য গোনাহ থেকে ইস্তিগফার করতে থাকো এবং আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করতে থাকো, হে আল্লাহ! এ সকল গোনাহ্র (ক্ষতির) অনুভূতি এবং এ থেকে মুক্তির উপায় আমাকে বুঝিয়ে দাও। যদি আমার বুঝার যোগ্যতা না থাকে, তাহলে উপকরণ ব্যতীতই কেবলমাত্র নিজ দয়া ও রহমত দ্বারা এ সকল দোষের সংশোধন করে দাও।

এটাও ইনশাআল্লাহ মুক্তি ও নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আর আমাদের উদ্দেশ্যও নাজাত লাভ করা। এর অতিরিক্ত কিছুর জন্য আমরা আদিষ্ট নই। (আশরাফুস সাওয়ানেহ ২য় খন্ড)

একটি দীর্ঘমেয়াদী সময় পর্যন্ত এর উপর আমল করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এতে আল্লাহপাকের রহমত, দয়া এবং ফযল লাভ হবে। সাথে সাথে আত্মশুদ্ধি লাভ হবে। এটা আল্লাহপাকের অসীম রহমত ও কুদরতের সামনে অসম্ভব কোন বিষয় নয়।

তাছাওউফের সারকথা

সেই সামান্য কথা! যা তাছাওউফের সারাংশ, তা এই যে, যদি কোন ইবাদত করতে অলসতা অনুভূত হয়, তাহলে অলসতার মুকাবেলা করে সেই ইবাদত করতে থাকা। আর যদি কোন গোনাহের আগ্রহ হয়, তাহলে সেই আগ্রহের মুকাবেলা করে ঐ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। যে ব্যক্তি এ দু'টি কাজ করতে সক্ষম তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কারণ এটাই আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায়। এটাই তাকে পাপ থেকে রক্ষা করে আল্লাহর পথে অগ্রসর করে দিবে।

[হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ)]

খাতেমা বিলখাইর

খাতেমা বিলখাইর, অর্থাৎ ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়াকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত মনে করবে। সর্বদা, বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর অত্যন্ত বিনয় ও আকুতির সাথে এজন্য দু'আ করবে এবং ঈমান লাভ হওয়ার প্রতি শোকর আদায় করবে। কারণ আল্লাহপাকের ওয়াদা

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [তোমরা যদি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমি নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দিবো।]

শোকর অনুযায়ী নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ এটাও খাতেমা বিল খাইরের একটি বিশেষ উপকরণ। (হযরত থানভী (রহঃ)-এর অসীয়ত)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই বিরাট নেয়ামত দান করুন।

اَللّٰهُمَّ لَقِّنِّىْ حُجَّةَ الْإِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ

হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর সময় ঈমানের দলীল শিখিয়ে দিন।

পূর্ণ এবং মজবুত ঈমান দান করুন। নেক আমল করার এবং সুন্নাতের অনুসরণ করার পরিপূর্ণ তাওফীক দান করুন। এর উপর দৃঢ়পদ থেকে খাতেমা বিলখাইর নসীব করুন। আমীন

يارب العالمين بحرمة سيد المرسلين رحمة للعلمين شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

কতিপয় মাসনূন অযীফা

(১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি (নিম্নে প্রদত্ত) এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব এবং জরুরী হয়ে যাবে। (যাদুস্ সাঈদ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি সাইয়্যেদানা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি (আপনার বিশেষ) রহমত নাযিল করুন এবং তাঁকে এমন মাকামে অধিষ্ঠিত করুন, যা আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়।

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট সাদকা-খয়রাত করার মতো সম্পদ নেই, সে যেন দু'আ করার সময় দু'আর মধ্যে এই দুরূদ শরীফ পড়ে। এটা তাঁর জন্য আত্মশুদ্ধির কারণ হবে। (আত্ তারগীব)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রহমত নাযিল করুন। আপনি রহমত নাযিল করুন সকল ঈমানদার নর-নারী এবং সকল মুসলিম নর-নারীর প্রতি।

(৩) হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করবে, সে ঐ দিন এবং রাতে সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থঃ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। যার নামের বরকতে জমিন ও আসমানে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারে না যিনি সবকিছু শুনেন এবং জানেন। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহপাকের সকল পূর্ণাঙ্গ কালিমা দ্বারা সকল সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে।

(৪) সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইখলাস ও ইয়াকীনের সাথে অন্তরের একাগ্রতা সহকারে দিন এবং রাতের কোন এক সময় এই ইস্তিগফার পাঠ করবে, সে ঐ দিন বা রাতে মৃত্যুবরণ করলে নিঃসন্দেহে বেহেশতে যাবে। (বুখারী শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি স্বীয় আমলের অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের উপর আপনার নেয়ামতসমূহ স্বীকার করছি। আমি স্বীয় গোনাহ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করুন। কেননা আপনি ব্যতীত গোনাহ মাফ করার মতো কেউ নেই।

(৫) হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন চিন্তায় পড়তেন, তখন নিম্নোক্ত দু'আ করতেন। (কাজেই আমাদেরও অধিক পরিমাণে এই দু'আ পাঠ করা উচিত।

يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

অর্থঃ হে حی! (চীরঞ্জীব) ও قیوم (সবকিছুর ধারক) আপনার রহমতের সাহায্য চাই।

এছাড়া বুযুর্গানে দ্বীনের এ অভ্যাসও ছিলো যে, বিপদ-আপদ, কঠিন অসুখ ও দুশ্চিন্তার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

অর্থঃ আপনি ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত।

ইশা নামাযের পর প্রথমে এগারবার দুরূদ শরীফ অতঃপর এই আয়াত একশত এগারবার পাঠ করবে এবং শেষে পুনরায় এগার বার দুরূদ শরীফ পড়ে নিজের প্রয়োজন মতো দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ হবে।

যখন কোন পেরেশানী-দুশ্চিন্তা কিংবা কারো কষ্ট দেওয়ার ফলে দুঃখ হয়, তখন অধিক পরিমাণে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে।

یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ

ইনশাআল্লাহ! দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি লাভ হবে।

শাজারাহ

যে সকল লোক কোন সিলসিলার বুযুর্গের নিকট মুরিদ হয়েছেন, তাদের জন্য নিজ সিলসিলার বুযুর্গদের 'শাজারাহ' পাঠ করা অত্যন্ত কল্যাণ ও বরকতের জিনিস। এর বরকতে আল্লাহপাকের পক্ষ হতে সেই সিলসিলার মাশাইখে তরীকতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক ও মুহাব্বত পয়দা হয়ে থাকে। 'শাজারাহ' পাঠ করা সকল সিলসিলার বুযুর্গদেরই নিয়ম আছে। আমাদের হযরত থানভী (রহঃ)-এর কবিতারূপ একটি 'শাজারাহ' আছে। সেটি নিম্নে লিখে দেয়া হলো। এই সিলসিলার

লোকেরা যদি এই 'শাজারাহ'কে প্রতিদিন ফজরের পরের যিকির-আযকারের সাথে পড়তে পারেন, তাহলে ভাল। অন্যথায় সপ্তাহে একবার পড়াও যথেষ্ট হবে।[১]

শাজারাহ পাঠ শেষে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত অথবা শুধুমাত্র সূরা ইখলাস কমপক্ষে তিনবার পাঠ করে, সিলসিলার বুযুর্গদের পবিত্র রূহের জন্য 'ঈসালে ছওয়াব' ও মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকবে। এতে করে 'বাতেনী নিসবত' শক্তিশালী হবে। তদ্রূপ এ নিয়মও করে নিবে যে, নিজ বংশের মৃত বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ও আত্মীয়-স্বজনের রূহের জন্যও 'ঈসালে ছওয়াব' ও মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকবে। কারণ এটাও মুহাব্বতের একটি জরুরী হক। তাদের আত্মা এতে উপকৃত হয়। এ কথা হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। এটা দোযখ থেকে মুক্তি ও আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়ে থাকে।

شجره

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تهانوی

رحمت الله علیه

از طفیل ذات پاك وبهر ختم المرسلین

بهر حق اولیاء وبندگان صالحین

بهر عبد الحی که وصفش عارفی شد بالیقین

رهبر راه طریقت عارف اسرار دین

حضرت اشرف علی نور نگاه عارفین

رهنمائے راه حق ورهبر دین مبین

টীকাঃ ১. শাজারাহ পাঠ করা (এজন্য জায়েয) যে, এতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামের অসীলা দিয়ে দু'আ করা হয়। যার বৈধতা হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যদি এই ধারণায় শাজারাহ পড়া হয় যে, এ সকল বুযুর্গের নাম পাঠ করার এই ফায়দা হবে যে, তারা আমাদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখবেন, তাহলে এটা একান্তই ভুল হবে এবং এটি একটি ভিত্তিহীন আক্বীদা। নিম্নোক্ত আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছেঃ ولا تقف ما ليس لك به علم (ইসলাহী নেসাব ৫২৩ পৃঃ) কাজেই শাজারাহ পাঠ করার সময় এ কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (অনুবাদক)

حضرت امداد و نور وحاجی عبد الرحیم

عبد باری. عبد هادی عضد دین مکی امین

شه محمدی و محمد شه محب وبوسعید

شه نظام و شه جلال و عبد قدوس فطین

سیدی شیخ محمد شیخ عارف عبد حق

شه جلال و شمس و صابر شه فرید و قطب دین

شه معین و شاه عثمان زندنی مودود شاه

شه ابو یوسف ولی وبو محمد ذی الیقین

شه ابی احمد ابي اسحق ممشاد علو

بو هبیره شه حذیفه ابن ادهم شاه دین

شه فضیل وعبد واحد شه حسن حضرت علی

آتنا الحسنت فی الدارین رب العلمین

মাসনূন দু'আসমূহ

মিসওয়াক করা, চোখে সুরমা লাগানো এবং মাথা আচড়ানো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত অভ্যাস ছিলো, তিনি এ সকল কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

(১) ঘুম থেকে উঠার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (মৃত্যুর ন্যায় ঘুম) দান করার পর জীবন দান করেছেন। আর তাঁর নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

(২) বাইতুল খালায় প্রবেশের (আগের) দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি নর-নারী উভয় প্রকার দুষ্ট জ্বিন থেকে।

(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

(৩) বাইতুল খালা থেকে বের হওয়ার (পরের) দু'আ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

অর্থঃ (হে আল্লাহ্! আমি) আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমার শরীরের ভেতরের ময়লা ও কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে আরাম দান করেছেন।

(ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

(৪) উযূর শুরুতে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থঃ ঐ আল্লাহর নামে উযূ শুরু করছি যিনি অত্যন্ত মেহেরবাণ ও দয়ালু।

(৫) উযূর মাঝখানে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ্ মাফ করুন এবং আমার গৃহকে প্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।

(৬) উযূ শেষের দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি মহা পবিত্র হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা (ভিক্ষা) চাই এবং আপনার নিকটই আমি প্রত্যাবর্তন করছি।

(৭) মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ার খুলে দিন। (ইবনে মাযাহ্ শরীফ)

(৮) মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আপনার দয়া (ভিক্ষা) চাই। (ইবনে মাযাহ্ শরীফ)

(৯) আযানের পরের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! এই পূর্ণাঙ্গ দা'ওয়াত এবং আগত নামাযের আপনিই প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন

উসিলা এবং ফযীলত আর মকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) তাঁকে পৌঁছে দিন, যার ওয়াদা আপনি তার সাথে করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(১০) খানা শুরুর দু'আ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহ্র নামে (খানা শুরু করছি) এবং আল্লাহর দেওয়া বরকতের সাথে।

(১১) খানা শেষের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদেরকে (খানা) খাওয়ালেন এবং পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

(তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও ইবনে মাযাহ্)

(১২) কাপড় পরার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমি আমার সতর ঢাকছি এবং যা দ্বারা সজ্জিত করছি নিজ জীবন।

(১৩) বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ

অর্থঃ আমি আল্লাহ্র নামে বের হলাম এবং তাঁরই উপর ভরসা করলাম।

(১৪) বাড়ীতে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا (ابو داود)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে (ঘরে) প্রবেশের কল্যাণ এবং (ঘর থেকে) বের হওয়ার কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহ্র নামেই আমরা

প্রবেশ করলাম। আল্লাহ্‌র নামেই বের হই এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। (আবু দাউদ শরীফ)

(১৫) ঘুমানোর দু'আ

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আপনার নাম নিয়ে আমি আমার পার্শ্ব (শয্যায়) স্থাপন করলাম এবং আপনারই অনুগ্রহে তা উত্তোলন করবো। যদি আপনি আমার রূহকে আবদ্ধ করেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করুন। আর যদি তাকে ছেড়ে দেন, তাহলে সে সকল উপায়ে তাকে হিফাযত করুন যে সকল উপায়ে আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।

(১৬) যানবাহন ও অন্যান্য জিনিসে আরোহণের দু'আ بِسْمِ اللّٰهِ

(১৭) আরোহণের পরের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করেছেন। যদিও আমরা তা বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবো।

(১৮) পছন্দনীয় কিছু হলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যার দান ও নেয়ামতগুণে যাবতীয় নেক কাজ সম্পন্ন হয়।

(১৯) অপছন্দনীয় কিছু হলে পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অর্থঃ সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(২০) ওয়াছওয়াছায় (সংশয়ে) লিপ্ত হলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থঃ প্রতারিত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্পাকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি ঈমান আনয়ন করলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।

(২১) যদি কারো উপর বদ নজর লাগে, তাহলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে তার গায়ে দম করবে। (ফুঁক দিবে)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

অর্থঃ আল্লাহর নামে (দম করছি) হে আল্লাহ! আপনি তার উত্তাপ, শীতলতা এবং কষ্ট দূর করে দিন।

جامع دعاء একটি ব্যাপক দু'আ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় সকল দু'আই এসে গেছে। কাজেই যদি সকল নামাযের পরে একবার এ দু'আ পড়া যায় তাহলে ভাল হয়। দু'আটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট ঐ সকল কল্যাণকর জিনিস চাচ্ছি, যা আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট চেয়েছেন এবং আমরা আপনার নিকট ঐ সকল জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা থেকে আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন।

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم - وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وامته وبارك وسلم كثيرا كثيرا